দাম : পঁচিশ টাকা

আমাদের রাষ্ট্রপতির
রাজনৈতিক জীবন
— পৃঃ ১৯

স্বস্তিকা

দ্রৌপদী মুর্মুর
পারিবারিক জীবন
— পৃঃ ২৫

৭৫ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২।। ৩ পৌষ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

আলোকবর্তিনী

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ৩ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৯ ডিসেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ২৫ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণ ☐ ৬

দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা সকলকে সংরক্ষণের আওতায় আনা দরকার ☐ ৭

স্নেহের স্নিগ্ধ পরশে বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা প্রবল
☐ অশ্বিন সাংঘি ☐ ৮

দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী
☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

জনজাতিদের উত্তরণ না ঘটালে ভারতবর্ষ অস্থির হতো
☐ কল্যাণ চক্রবর্তী ও অরিত্র ঘোষদস্তিদার ☐ ১১

হিন্দুত্বের জঠরেই জনজাতিদের পূর্ণতা
☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১৪

হিন্দুদের গাজন জনজাতিদের উৎসব ☐ মলয় চৌধুরী ☐ ১৮

আমাদের রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক জীবন ☐ তথাগত রায় ☐ ১৯

ভারতের বিস্মৃত মানুষেরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি
☐ অর্জুন মুণ্ডা ☐ ২২

দ্রৌপদী মুর্মুর উত্থানে আলোকিত জনজাতি সমাজ
☐ কৌশিক রায় ☐ ২৪

দ্রৌপদী মুর্মুর পারিবারিক জীবন ☐ ড. জিষ্ণু বসু ☐ ২৫

ধরাশায়ী ভারতীয় রাজনীতির অভিজাততন্ত্র
☐ ড. তরুণ মজুমদার ☐ ২৮

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও জনজাতি সমাজের অনুভূতি
☐ ডাঃ চুনারাম মুরমু ☐ ৩১

সাক্ষাৎকার : দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হবার খবরে খুশি জনজাতি সমাজ ☐ ৩২

চোদ্দ বছর শ্রীরামচন্দ্র জনজাতিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন
☐ হীরক কর ☐ ৩৫

চুড়কা মুর্মুর বলিদানের সরকারি মর্যাদা দেওয়া হোক
☐ অদ্বৈতচরণ দত্ত ☐ ৩৯

স্বধর্ম ও স্বদেশ রক্ষায় জিতু সাঁওতালের অবদান
☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ৪১

লোকশিল্পীরা ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন সাধারণ মানুষকে
☐ কালিকানন্দ মণ্ডল ☐ ৪৩

রাষ্ট্ররক্ষায় জনজাতি সমাজের অবদান
☐ উত্তম কুমার মাহাতো ☐ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কেন জরুরি ?

সম্প্রতি রাজ্যসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিল পাশ হয়ে গেল। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই বিলটি আইনে পরিণত হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রবর্তন কেন জরুরি।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা।

লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বামীজীর ভাবনার ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে

বেলুড়মঠে কাজ করিতে আসা সাঁওতাল শ্রমিকদিগকে স্বামীজী বলিতেন 'ইহারা যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ, এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালোবাসা আর কোথাও দেখি নাই।' সত্যিই ইহারা নারায়ণ। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা তো ইহাদের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। এই নারায়ণী সেনার এক একজন তো শ্রীকৃষ্ণের মতোই অপরাজেয় যোদ্ধা ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেনাবাহিনীর সিংহভাগ পর্বত ও অরণ্যবাসী জনজাতিদের লইয়াই গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। বস্তুত, মহাভারতের ভারতবর্ষ অরণ্য ও পর্বতবাসীদের সহযোগেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারও পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের সখা ও সহযোগী ইহারাই ছিলেন। দুরাচারী রাবণকে নিধন করিতে শ্রীরামচন্দ্র গিরিবাসী বনবাসী জনজাতিদের উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন। সহজ সরল জনজাতির লোকেরাও শ্রীরামচন্দ্রকে একান্ত আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি জনজাতি সমাজের মানুষদিগের নিকট শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ একান্ত আপনার জন। আবহমানকাল হইতেই এই জনজাতি সমাজ ভারতবর্ষীয় সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। পুরাণমতে ইহারা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের বংশধর। স্বভাবতই ইহারা হিন্দু সমাজেরই অভিন্ন অঙ্গ। পাঠান মুঘল শাসনকালে স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষায় বিধর্মী শাসনের উচ্ছেদকল্পে ইহারা কখনো নিজেরাই, কখনোও-বা মহারাণা প্রতাপ অথবা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সহযোগী হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালেও তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে মরণপণ লড়াই করিয়াছিলেন। ধূর্ত ও চতুর ব্রিটিশরা জন্মযোদ্ধা জনজাতিদের 'আদিবাসী' তকমা দিয়া ভারতবর্ষে জাতি বিদ্বেষের চেষ্টা চালাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শবর জনগোষ্ঠীকে তো ইংরাজরা ক্রিমিনাল ট্রাইব বলিয়া দাগিয়া দিয়াছে।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস-কমিউনিস্ট রাজনীতিক এবং বাম-সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজদের সেই বিভেদনীতিকে আরও ইন্ধন জোগাইয়াছেন। অনবরত তাহারা 'জনজাতিরা হিন্দু সমাজের অঙ্গ নহে' বলিয়া প্রচার চালাইয়াছে। ইহারই সুযোগ লইয়া খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সহজ সরল মানুষদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। ইহাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে সেবার আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারিরা এই দেশে জাঁকিয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা জনজাতিদের নাম লইয়া শুধুমাত্র রাজনীতি করিয়াছে। তাঁহাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কোনোরূপ চেষ্টা করে নাই। ভারতের ইতিহাস,সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত জনজাতিরা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাহা স্বীকার করিবার পরিবর্তে হিন্দু সমাজের সহিত তাহাদের ব্যবধান বৃদ্ধি করিয়াছে।

রাষ্ট্রভক্তদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় এখন সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জনজাতিরা যে ভারতবর্ষীয় সমাজের অভিন্ন অঙ্গ তাহা পদে পদে প্রস্ফুটিত হইতেছে। স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে বিগত আট বৎসর ধরিয়া জনজাতি ভাই-বোনেরা দেশের প্রতিটি প্রকল্পের, প্রতিটি কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পের সাফল্য দেশের এগারো কোটি জনজাতি পরিবারের জীবনকে সহজ সরল করিয়া তুলিয়াছে। দেশের উন্নয়ন যজ্ঞে তাহারা শামিল হইয়াছেন। স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দেশের প্রান্তিক মানুষটির উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নহে, তাই সর্বাগ্রে সমাজের পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর উত্থানের আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে সেই আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। জনজাতি সমাজ হইতে জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কাহারও উঠিয়া আসা এই দেশে বিরল ছিল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি সমাজ হইতে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করিয়া সেই আয়োজনে গতি প্রদান করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া আবার একবার প্রমাণিত হইল ভারতবাসীর রক্তের ধারা এক, তাহাদের ডিএনএ এক। এইকথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে, শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি পদে উত্তরণের মধ্য দিয়াই স্বামীজীর ভাবনার ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে। তিনিই নব ভারতের আলোকবর্তিনী।

সুভাষিতম্

ক্বচিদ্রুষ্টঃ ক্বচিত্তুষ্টো রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ।।

কখনো রুষ্ট, কখনো তুষ্ট। ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট। এই প্রকার চঞ্চলচিত্ত মানুষের প্রসন্নতাও ভয়ংকর হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণ

কোভিড প্রাদুর্ভাবের পরে আরও বেশি করে বিশ্ব এক নতুন ভারতকে উত্থিত হতে দেখেছে। ১৪ আগস্ট দিনটিকে দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস হিসেবে পালন করা হয় যাতে সামাজিক সম্প্রীতি ঐক্য প্রচারিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেলাম :

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট আমরা ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল কেটে ভাগ্যকে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ ও প্রাণ বলিদান করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

গণতন্ত্র :

ভারতের মাটিতে গণতন্ত্র শুধু শিকড়ই গাড়েনি, সমৃদ্ধও হয়েছে। বিশ্বকে গণতন্ত্রের প্রকৃত সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য ভারতকে কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে।

শুরু থেকেই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার :

বিভিন্ন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে মহিলাদের ভোটাধিকার পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু ভারত গণতন্ত্রের শুরু থেকেই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

দেশের প্রতিটি কোণে তেরঙ্গা :

দেশের প্রতিটি কোণে ভারতীয় তেরঙ্গা উড়ছে। স্বাধীনতার জন্য এই চেতনাকে এত বিশাল আকারে দেখলে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জনজাতিদের কথা তুলে ধরেছে সরকার :

জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়েছে।

২০৪৭-এর মধ্যে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন :

২০৪৭ সালের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

বর্তমান ভারত দরিদ্রদের প্রান্তিকদের :

বর্তমান ভারত গরিবদের জন্য, প্রান্তিকদের জন্য।

নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে :

ভারতের আত্মবিশ্বাস তার যুবক, কৃষক ও নারীদের নিয়ে। দেশের লিঙ্গ বৈষম্য কমেছে এবং নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে।

নতুন ভারত :

কোভিড প্রাদুর্ভাবের পরে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্ব এক নতুন ভারতকে এগিয়ে যেতে দেখেছে। অর্থনৈতিক সাফল্য জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যের রূপ নিচ্ছে।

দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা সকলকে সংরক্ষণের আওতায় আনা দরকার

সুবল সরদার

জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা কখনো জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কাম্য হতে পারে না। কিন্তু মানুষ নিজের অধিকার কায়েম করতে জনজাতিদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তা বলা বাহুল্য। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও বৈষম্যের শিকার জনজাতিরা, সেকথা অস্বীকার করে কে? তার সেই বৈষম্যের শিকড় কেউ নির্মূল করতে পারে না, কেউ কখনো পারবে কিনা ঠিক নেই। সেই পাপের বোঝা আমাদের রক্ত থেকে রক্তে, রন্ধ্র থেকে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সংবিধানের ১৫, ১৬ অনুচ্ছেদে এসসি/এসটিদের সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষণের মাধ্যমে সমতা এনে শোষণমুক্ত সমাজ তৈরি করা। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকার সংবিধান সংশোধন করে মণ্ডল কমিশনের মাধ্যমে ওবিসিদেরও সংরক্ষণের আওতায় আনে। এসসি ৭.৫ শতাংশ, এসটি ১৫ শতাংশ, ওবিসি ২৭ শতাংশ নিয়ে হয় মোট ৪৯.৫ শতাংশ। ৪৯.৪ শতাংশ সংরক্ষণ বেঁধে দিয়ে বলা হয় সংরক্ষণ কখনো ৫০ শতাংশে যাবে না, আদালত এমন অভিমত দেয় ইন্দ্র সাহনে মামলায়। সংবিধানের ৩৩৪তম অনুচ্ছেদে এই সংরক্ষণের সময়সীমার কথা বলা আছে এবং এই সংরক্ষণের সময় সীমা ২০৩০ পর্যন্ত থাকার কথা। সিনহো কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এসসি ৩৮ শতাংশ, এসটি ৪৮ শতাংশ এখনো দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের সঙ্গে আইনগত সুযোগ সুবিধা দিতে তৈরি হয় এসসি/এসটি অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট ২০০৫। এসসি/এসটি-র উপর কোনোরকম নিপীড়ন, অত্যাচার হলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার করে নিষ্পত্তি করার বিধান আছে।

বিনামূল্যে আইনগত সুবিধা নিতে পারেন জাতিগত শংসাপত্র দেখিয়ে। কিন্তু সহজ সরল জনজাতিদের এটা কে জানাবেন? এসসি/এসটিদের নিয়ে এখনো কোনো মামলা জেলা জজ কোর্টে হয়েছে বলে জানা নেই। এটাই হচ্ছে বর্তমান সংরক্ষণ এবং তার আনুষঙ্গিক

চিত্র। কিন্তু সংরক্ষণের আওতায় থাকলেও জনজাতিরা এখনো পিছিয়ে পড়ে আছে, সিনহো কমিশনের রিপোর্ট সেই কথা বলে। সংবিধানের ১০৩তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে ইডব্লিউএস (ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন) কোটার কথা। এখানে বলা হয়েছে উচ্চবর্ণের লোকেরা যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে তাদের ১০ শতাংশ কোটায় সংরক্ষণ দেওয়া হবে। এই ১০ শতাংশ সংরক্ষণ নিয়ে সংরক্ষণের মোট কোটা হবে ৫৯.৫ শতাংশ। উচ্চবর্ণের কারা এই সংরক্ষণের আওতায় আসবেন? যাদের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার কম, পরিবারের মালিকানাধীন ৫ একরের কম জমি থাকতে হবে, ১,০০০ বর্গ ফুটের কম ফ্ল্যাটে বা জায়গাতে বসবাস হবে, পুরসভার ১০০ গজের কম এবং পুরসভার বাইরে ২০০ গজের কম জায়গাতে বসবাসকারীরা এই কোটার সুযোগ পাবেন।

এই সংরক্ষণ কি সত্যি উন্নয়নের লক্ষ্যে না, ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে দেওয়া হচ্ছে? জনজাতিরা সত্যি কি কখনো সমতা পেয়েছেন? পাঁচ একরের কম জমির মালিকরা কেমন করে সংরক্ষণের কোটায় আসে মাথায় ঢুকছে না। যদি বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার কম হয়, মাসিক আয় হবে ৬৬.৬৬৬ হাজার টাকা। একটা পরিবার বলতে মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী-সহ তাদের একটা বা দুটো সন্তান, যাদের মাসিক আয় ৬৬.৬৬৬ হাজার টাকা। এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারীরাও ১০ শতাংশ কোটায় সংরক্ষণের অধিকারী হবেন, এটা ঠিক নয়। এমন উচ্চ বর্ণের এই সংরক্ষণ সত্যি খুব মানানসই কি? উচ্চ বর্ণের মধ্যে যারা বেঁচে থাকার জন্যে পোড়া রুটির স্বপ্ন দেখেন, তাদের কি এবার সেই স্বপ্ন দেখা বন্ধ হবে? সংরক্ষণের সুবিধা কারা পান? কোভিডে শ্রমিকদের ক্লান্ত পায়ের ছবি দেখেছি।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জন্যে তপ্ত রোদে ছেলে কোলে নিয়ে মায়েদের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে দেখেছি। রেশন দোকানে ভোর থেকে এখনও লম্বা লাইন দেখি। এই সংরক্ষণের অধীনে এনে তাদের এমন দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনার অবসান ঘটবে? এই সংরক্ষণে গরিবদের মুক্তি, না তারা কেবল ভোটব্যাংক? অভিশাপ নিয়ে যারা দারিদ্রসীমার নীচে, সকলকে সংরক্ষণের অধীনে আনা দরকার সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ দেখে সংরক্ষণ নয়, এমনটাই হওয়া দরকার ছিল।

অতিথি কলম

অশ্বিন সাংঘি

স্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শে বিশ্ব জয়ের সম্ভাবনা প্রবল

সারা বিশ্বের কাছে নিজেকে সঠিকভাবে উন্মোচিত করার মুহূর্ত হয়তো ভারতের কাছে আজ সমাগত। মহা অখণ্ড ভারত রূপ কল্পনাকে কেন্দ্র করে ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতার সংস্কৃতিকে আবার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতার নামই তো আজকের পরিভাষায় সফট্ পাওয়ার।

সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়া 'টাইমস নাউ' আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংস্থার উপাধ্যক্ষ পরিচালক সমীর জৈন জানিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই এটি মহাভারতের সময় নয়। অখণ্ড ভারতও সেই সূত্রে আজ ইতিহাসের পাতায়। আজ সময় 'মহা অখণ্ড ভারতের' বাস্তবতার। বিষয়টা নিয়ে আমার একটি চিন্তাসূত্র খুলে গেল। অখণ্ড ভারতের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছিলেন বীর সাভারকর সেই ১৯৩৭ সালের হিন্দু মহাসভার এক সম্মেলনে। তিনি কেবলমাত্র আদিতে অখণ্ড ভারতের এক ভৌগোলিক পরিসরের কথা বুঝিয়ে ছিলেন। আমার কাছে অখণ্ড ভারতের উল্লেখ আরও প্রাচীনতর এবং ভৌগোলিকভাবে দীর্ঘায়িত অতীত বৈদিক প্রভাবে আবদ্ধ এক বিশাল অঞ্চলের মুছে যাওয়ার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। যা ছিল নিরেট সত্য।

(১) মহাভারতের মাতা গান্ধারী এসেছিলেন আজকের কান্দাহার দেশ থেকে।

(২) ইরানের নামের উৎসে রয়েছে এরিয়ানএমডায়েজা অর্থাৎ the land of the Aryans —আর্যদের বাসভূমি।

(৩) বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিষ্ণুমন্দির যেখানে অবস্থিত সেটি আজকের ভারতে নয় সেই 'অঙ্কোরভট' রয়েছে কম্বোডিয়ায়।

(৪) দুটি প্রাচীন রাজবংশ হিটাইটস ও মিত্তানি (যা আজকের ভৌগোলিকভাবে তুরস্ক ও সিরিয়া) নিজেদের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি করেছিল ১৩৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তারা এই চুক্তির সময় সেখানে বেদের দেব-দেবী মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতিদের প্রতিষ্ঠা দেয়।

(৫) গ্রিকরা নাম বদলে বরুণদেবকে তাদের Uranus নামে বরণ করে।

(৬) দু'জন অতি প্রাচীন ভারতীয় ঋষি পরিব্রাজক কশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ উভয়েই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থকে চীনে নিয়ে যায়। বোধিধর্ম নামের শক্তিমান মানুষটি মার্শাল আর্টকে আজকের শাওলিন অঞ্চলে প্রথম প্রচার করেন।

(৭) ইন্দোনেশিয়ার কুড়ি হাজার টাকার নোটে আজও স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয় গণেশের ছবি।

(৮) থাইল্যান্ডের প্রচলিত ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত চকরি রাজবংশ আজও শ্রীরামের নাম ব্যবহার করেন এবং তাদের রাজকীয় চিহ্নের এয়ারওয়েজের নাম গরুড়।

(৯) মালয়েশিয়ায় প্রাচীন হিকায়ত সেরি রাম (যা রামায়ণের মালয়েশীয় রূপ) আজও মানুষের কাছে পুতুলনাচের প্রতীকে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

এ থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসে অতীত ভারতের সফট্ পাওয়ারের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই লুপ্ত পদ্ধতিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা কি অন্যায় হবে? উল্লেখিত পূর্বপ্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে আমাদের সদর্থক পুনরুত্থান জাগিয়ে তোলা কি 'মহা অখণ্ড ভারতের প্রচেষ্টা নয়? যদিও ভারত আজ পৃথিবীতে আর্থিক পরিমাণগতভাবে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি-র হিসেবে বিশ্বে আমাদের স্থান নিম্নস্তরে ১২৭। তাহলে অবস্থা পরিবর্তনে আন্তর্জাতিকভাবে কি আমরা সফট্ পাওয়ার (যা বাস্তবে অতীত সংস্কৃতির ব্যবহার) প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে পারি না? এর জন্য প্রয়োজন সংকল্পবদ্ধ ও অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত পরিকল্পনা।

দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা k-pap, parasite ও squid garme-এর প্রচারের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার পরিচিতি পুনরুদ্ধারের কাজে সফল হয়েছে। কিংবা খোদ ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন যারা ব্রিটিশ কাউন্সিল নামে এক শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছে। একবাক্যে দীর্ঘদিন মিডিয়ার (তখন মিডিয়াই শব্দটি তেমন প্রচলিত ছিল না) বেদবাক্য বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস দাপটের সঙ্গে খবরের মাধ্যমে বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মহিমা মণ্ডন বা ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপক প্রচার বহাল ছিল। তাহলে ভারত তার নিজস্ব প্রভাব বাড়াতে কী কী করতে পারে? অনেক কিছু কিন্তু করার আছে।

(১) **আয়েঙ্গার পুরস্কার :** প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ও অনুশীলিত যোগাভ্যাস এমনই একটি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এটির সুপ্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব আজ যোগদিবস পালন করে। এটিই সঠিক পথে প্রথম ধাপ। এই যোগাভ্যাসের প্রথম প্রচার করেছিলেন যোগগুরু বি কে এস আয়েঙ্গার। তাঁর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করে সেটিকে যোগের ক্ষেত্রে

চলচ্চিত্রের অস্কারের মতো শ্রেষ্ঠ সম্মাননীয় করে তোলা যেতে পারে। এই অর্থ বরাদ্দ করে 'আয়েঙ্গার প্রশংসাপত্র' দিলে তা বিশ্বে গ্রাহ্য হবে এবং ভারতের নাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২) **বৌদ্ধ পর্যটন :** বিশ্বের ৫৩.৫ কোটি মানুষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু এঁদের গরিষ্ঠাংশই জানেন না যে এর উৎসস্থল ভারত। বৌদ্ধদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থলগুলির অধিকাংশই ভারত ও নেপালে অবস্থিত। যেমন বুদ্ধগয়া, রাজগীর, নালন্দা, কুশীনগর, লুম্বিনী, শ্রাবস্তী বা সারনাথ। কিন্তু এগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরে সবকটি স্থানের সঙ্গে সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক tourist circuit খোলা দরকার। উদাহরণ দিলে সহজ হবে, মক্কা হোক বা প্রয়াগ ধর্মীয় ভ্রমণ বা যাকে বলে পবিত্র স্থান দর্শনের সহজ ব্যবস্থা থাকলে সেই ব্র্যান্ডও দেশের যুগপৎ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করে।

(৩) **চলচ্চিত্রের ইন্দ্রজাল :** ভারতে বিভিন্ন ভাষা ধরে এখন বছরে ১৬০০ ছবি তৈরি হয়। বাস্তবে ভারত ও বিদেশে থাকা মুষ্টিমেয়দের বাইরে সেই সমস্ত চলচ্চিত্র তেমন প্রচারিত হয়? আমরা DFF, IFFI (International film festival of India), NFDC (National film Dev. Corporation) প্রভৃতিতে কোটি কোটি টাকা ঢালি। দিনরাত শোরগোল বাঁধিয়ে রাখি ভারত কেন অস্কার প্রতিযোগিতায় তেমন সুযোগ পায় না? হায়! যে সমস্ত ছবি ভারতে বড়ো সাফল্য পেল সেগুলিকে কেন আমরা বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ করি না। এটিকে তো আগেই শিল্প ঘোষণা করা হয়েছিল।

(৪) **শুশ্রূষার স্পর্শ :** বিশ্বের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিরাময়ের বিকল্প ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই ভারতের আয়ত্তাধীন রয়েছে যেমন আয়ুর্বেদ, প্রাণায়াম, পঞ্চকর্ম, নেচারোপ্যাথি প্রভৃতি। এছাড়া আমাদের হাতে রয়েছে ৫৭৯টি উদ্ভিদ সংক্রান্ত বৈদিক নিরাময় ব্যবস্থার নিদান। যেমন হলুদ থেকে অশ্বগন্ধা বা মুলাইথি যার কথা বিশদে বলা আছে অথর্ব বেদে। মানসিক চাপ কমাতে ও মনে প্রশান্তি ফেরাতে ধ্যানের অভ্যাস এখন মূল চিকিৎসা ধারায় জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সঙ্গে PPP মডেলে বিশ্বের বহু দেশে বিশ্বমানের থেরাপি সেন্টার (ধ্যান সংক্রান্ত) তৈরির কথা ভাবা যায় না?

(৫) **সংস্কৃত ভাষার উত্থান :** সংস্কৃত ভাষাই আমাদের প্রাচীন প্রজ্ঞা ভাণ্ডারের মূল প্রকাশ মাধ্যম। আজকের জার্মানি খুব দ্রুত সংস্কৃত ভাষাকে আত্মস্থ করে তার প্রসার করছে। সেখানে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার উন্নয়নে অজস্র আসন নির্দিষ্টকরণ হচ্ছে। এখনই বিভিন্ন দেশে ভারতীয় কেন্দ্র খুলে India knowledge অর্থাৎ ভারত যে কত অগ্রবর্তী ছিল তার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

(৫) **চিকেন টিক্কা মশালা :** কথাটা হালকা হলেও সারা পৃথিবীর লোক আজ হলুদ দেওয়া মশালাদার খাবারের দিকে ঝুঁকছে। তারা মশালা চা, খাঁটি ঘি ও নানান নিরামিষ খাবার পরীক্ষা করে পাশ করিয়ে পছন্দের তালিকায় রেখেছে। ভারতের নানা হোটেলের সেরা রন্ধনকুশলীদের নিয়ে আমরা ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় খাদ্যে সমৃদ্ধ পদগুলিকে সারা বিশ্বের কাছে বিতরণ করার ব্যবস্থা করতে কি পারি না? মনে রাখবেন, জেআরডি টাটার এয়ার ইন্ডিয়া ও ববি কোকার বিখ্যাত লোগো মহারাজা কতকাল আগে ভারতীয় খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল। এগুলিই তো সফ্‌ট পাওয়ারের মাধ্যমে বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে চাণক্য বলেছিলেন, সাম (শান্তভাবে বোঝানো), দান (অর্থনৈতিক অনুদান) দেওয়ার থেকে বেশি ফলপ্রসূ। এরপর ভেদ (সন্তর্পণে কিছু করা) ও সর্বশেষ দণ্ড অর্থাৎ সামরিক শক্তি প্রয়োগ। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে হয়তো এই কৌটিল্য নীতির পরিমিত ও সফল প্রয়োগের ফলেই ১২০০ বছর আগেও ভারত বিশ্ব জিডিপি-র এক চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। সেই মডেল কি ফিরিয়ে আনা যায় না? ■

লোকান্তরিত প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা মাতাজী

সারদামঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা মাতাজী গত ১১ নভেম্বর রাত্রি ১১টা ২৪ মিনিটে লোকান্তরিত হলেন। প্রয়াণকালে তিনি ১০২ বছর অতিক্রম করেছেন। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী

বিশ্বামিত্র

দ্রৌপদী মুর্মু। মাত্র কিছুদিন আগেই ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক তিনি। ভারতের সমাজজীবনে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে

নির্বাচিত হওয়ার আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। তিনি আমাদের দেশের প্রথম মহিলা জনজাতি এবং দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদকে কোনো রাজনৈতিক রঙে রাঙানো নিঃসন্দেহে অপরাধ। তবু দেশের প্রথম নাগরিক নির্বাচনে এনডিএ জমানায় বারবার যে দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সে কথা স্বীকার করতেই হয়। প্রথমবার অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বিজ্ঞানী এপিজে আব্দুল কালামকে, আর এখন দ্বিতীয়বারে দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে। এই দুই ঘটনারই প্রভাব ভারতীয় সমাজজীবন সুদূরপ্রসারী। একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য একদা বিদেশিদের আক্রমণে বহু মানুষ তরবারির সামনে মাথা নত করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আধুনিক ভারতে অনেক বিদেশি ভারতবর্ষকে শক্তিহীন করতে দ্বিজাতিতত্ত্বের আমদানি করে ভারতভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এবং সেই যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল, তার জ্বালায় ভোটব্যাংকের রাজনীতির মাশুল দিতে হয়েছে স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত ভারতবর্ষকে। এপিজে আব্দুল কলামকে দেশের প্রথম নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার প্রমাণ করেছিল, শুধু 'সংখ্যালঘুর অধিকার' বলে চেঁচিয়ে, সেই মুখোশের আড়ালে হিন্দুদের বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। তথাকথিত সংখ্যালঘুরাও যে ভারতভূমিরই অংশ, তাঁরা যে আরবজাত নন; ভারতের প্রতিও যে তাঁদের দায়বদ্ধতা আছে সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য দ্রৌপদী মুর্মুর ক্ষেত্রে। মুসলমান আক্রমণের ফলস্বরূপ উদারমনস্ক ভারতীয় সমাজে একপ্রকারের রক্ষণশীলতা একটা সময়ে গ্রাস করেছিল। আর আধুনিককালে সংখ্যালঘু তোষণকারীরা তাদের ভোটব্যাংক রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে সেই সুপ্রাচীন রক্ষণশীলতাকে ব্যবহার করে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার নেশায় হিন্দুসমাজে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত করেছিল। দ্রৌপদীর রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার প্রথম প্রয়াস মাত্র।

দ্রৌপদী মুর্মু বয়সের দিক দিয়ে ভারতের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতিও বটে এবং স্বাধীন ভারতে জন্ম নেওয়া প্রথমবার কেউ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন। প্রসঙ্গত, দ্রৌপদী মুর্মুর জন্ম ১৯৫৮ সালে। তিনি প্রশাসক হিসেবেও নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন ওড়িশা মন্ত্রীসভায় এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল রূপে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতির যে কোনো সিদ্ধান্তের পেছনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার দায়ভার থাকবে সামগ্রিক, তাঁর একার কোনোমতেই নয়। মাত্র মাস পাঁচেক হলো তিনি রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিয়েছেন, সুতরাং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ভূমিকা কী হবে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়াটা মূর্খের নামান্তর মাত্র হবে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে যেমন রাষ্ট্রপতির কোনো সিদ্ধান্তের পেছনে মন্ত্রীসভার বড়ো ভূমিকা থাকে, তেমনি অপরদিকে মর্যাদার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির স্থান সর্বোচ্চ। সেই মর্যাদাকেই আরও একটু মহিমান্বিত করেছে তাঁর জনজাতি পরিচয়। এটা ঠিক, ভারতের রাষ্ট্রপতির পরিচয় জাতপাতভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। তাঁর পদের মর্যাদা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এতকাল মিথ্যা ইতিহাস আমরা পড়ে এসেছি যে হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম আখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাল্পনিক অনৈতিহাসিক ঘটনা পড়িয়ে হিন্দুদের বিভক্ত করার সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে অন্তত প্রয়োজনীয় লাগাম পরানো যাবে। রাজনীতির বিষবাষ্প আজ এতোটাই গ্রাস করেছে যে তাঁকে নিয়ে অনায়াসে কুকথা বলা চলে, মন্ত্রী হলে তাঁর সাতখুন মাপ। হয়তো এর জন্য আমাদের দীর্ঘকালীন মানসিকতাও দায়ী। দায়ী আমাদের দলীয় রাজনীতিও। এর প্রতিবাদে ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়নি তাঁর দল। সুতরাং দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি রূপে মনোনয়নের মাধ্যমে আমাদের মানসিকতাকে উন্নত করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে সব অপপ্রচারকে সরিয়ে সুসংহত হিন্দু শক্তিকে প্রকাশেরও সুবিধা করে দিয়েছে। □

জনজাতিদের উত্তরণ না ঘটলে ভারতবর্ষ অস্থির হতো

কল্যাণ চক্রবর্তী ও অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের মধ্যে রাষ্ট্রপতি হলেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি একজন সাঁওতাল রমণী, তপশিলি উপজাতি পরিবারের সদস্য। তার আগে যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি একজন তপশিলি জাতি, তখনও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। স্বামীজী বলেছেন, 'যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।'

ভারতবর্ষের সংবিধানে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছে, তা স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাবের রূপায়ণ বলে মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। তাঁকে একজন সমাজতাত্ত্বিক বলেও দেখানো হয়। স্বামীজীকে 'নিপীড়িত' শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। যারা গরিব, শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে বসবাস করেন, সম্পদ ও উদ্বৃত্ত বলে যাদের কিছুই নেই, যারা প্রান্তিক উপজাতীয় মানুষ, বংশানুক্রমিকভাবে বঞ্চিত, তারাই নিপীড়িত। নিপীড়িত শব্দটির হিন্দি প্রতিশব্দই হচ্ছে 'দলিত', যা বামেদেরও পছন্দের পরিভাষা। তবে স্বামীজী 'জাত' বিষয়টিকে হিন্দুধর্মের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। স্বামীজীর পরিষ্কার বক্তব্য, এই জাত শ্রমবিভাগ নীতি-নির্ভর সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় চিন্তাধারা নয়।

হিন্দুর মননে ও বৈশিষ্ট্যে জাতিভেদপ্রথার এক নিয়মানুগ প্রতিষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন। তিনি এই সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য এবং জাতিভিত্তিক সুবিধাভোগের নীতিকে সমর্থন করেননি। সবার জন্য সমান সুযোগ চেয়েছিলেন এবং দুর্বলকে বেশি সুযোগ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জাতিভেদপ্রথার মন্দদিকগুলির জন্য হিন্দু ধর্মকে দোষী করেননি। বলেছেন, ধর্মীয় নয়, কর্ম ও শ্রেণীবিভাগের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জাতিভেদপ্রথা একান্তই একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজের উচ্চস্তরে থাকা মানুষকে নামিয়ে এর সমাধান করা যায় না। সমস্যা দূর করতে হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার করে নীচুজাতের মানুষকে উঁচুতে তুলতে হবে। বলেছেন, এ কাজের জন্য প্রচুর সময় দিতে হবে। স্বামীজী নিপীড়িত মানুষের বিকাশ ও উত্তরণ চেয়েছিলেন, কারণ— 'ওইসকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য রাজকররূপে পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলাভের জন্য শারীরিক পরিশ্রমে বড়ো বড়ো মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথি খাইয়া আসিয়াছে।'

প্রশ্ন উঠবে, স্বামীজী কীভাবে অর্জন করলেন অন্ত্যজ মানুষের প্রতি এই ভালোবাসা? স্বামীজী যাঁর শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেও সিদ্ধিলাভ সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা স্বীকার করতেন না। একবার এক অস্পৃশ্য মেথরের বাড়ি পরিষ্কার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। লোকটি তাতে সম্মত হলেন না। শ্রীরাকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণ, তার উপর সন্ন্যাসী তুল্য বিখ্যাত মানুষ। সেই পরম আধ্যাত্মিক পুরুষ তার ঘর পরিষ্কার করবেন, তাতে সম্মতি জানাবেন কী করে! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর রাত্রে অজ্ঞাতসারে তার বাড়ির চত্বরে ঢুকে পায়খানা পরিষ্কার করতেন এবং বড়ো বড়ো চুল দিয়ে সেই জায়গা মুছতেন। দিনের পর দিন এরকম করতেন তিনি। নিজেকে সকলের চাকর ও সেবক করে তোলার এক অনবদ্য সাধনা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। স্বামীজী বলেছেন এমন লোকের শ্রীচরণ তিনি মাথায় ধরে আছেন। হয়তো গুরু নির্দেশিত পথে স্বামীজী নিপীড়িত মানুষকে ভালোবেসেছেন। স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে যা খুব বেশি করে পাই, তা হলো শূদ্র-জাগরণের কথা। তাঁর 'স্বদেশ মন্ত্র' সেই বার্তারই গহন কথা। এই শূদ্র-জাগরণের মধ্যেই স্বামীজীর মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত

সংবিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ অনুভূত হয়। তা শ্রোতার অন্তরকে স্পর্শও করে, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরিয়ে তোলে। 'ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

স্বামীজী চেয়েছিলেন নতুন ভারত। যে ভারত বেরোবে লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। নতুন ভারত বেরোবে মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। এরা হাজার হাজার বছরের অত্যাচার নীরবে সয়েছে, সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, কিন্তু পেয়েছে সহিষ্ণুতা, অটল জীবনীশক্তি। যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়াটা উলটে দিতে পারে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।' স্বামীজীর যা স্বপ্ন ছিল, আমরা আজ তার সাকার রূপ দেখতে পেয়েছি। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আসনে যিনি আজ অধিষ্ঠান করছেন, ভারতবর্ষের সম্মানিত রাষ্ট্রপতি যিনি, তিনি কেবল তথাকথিত তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ নন, তিনি একজন মহীয়সী নারী। সাঁওতাল সমাজ থেকে উঠে এসেছেন তিনি, ভারতমাতার প্রতি আস্থা রেখে, ভারতমাতাকে উপাস্য দেবতা করেই তাঁর এই সর্বোচ্চ উত্থান।

উদাত্তকণ্ঠে স্বামীজীর আহ্বান ছিল, 'হে বীর! সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' বলেছিলেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা। উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আজ বুঝি, সেই সময় উপস্থিত যখন ভারতবর্ষের নানান উচ্চপদে নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের গৌরবময় অধিষ্ঠান। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে সওয়াল করেছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতবর্ষের 'প্রাচীন ইতিহাস' রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে অন্ত্যজ মানুষের কথা বিশেষ মর্যাদার উপস্থাপিত হলেও তা কিন্তু রাষ্ট্রবাদী মানুষ ছাড়া অন্যদের উদ্ধৃতিতে, লেখায়, আলোচনায় ফুটে ওঠে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিয়ে বামপন্থীদের যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কাজ করে, তার একটি ছোট্ট পরিচয় তুলে ধরা যাক। মহাশ্বেতা দেবী এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলায় লিখেছিলেন মাত্র।' (দেবী মহাশ্বেতা ১৩৯৫ কৃত্তিবাসের রামায়ণে অন্ত্যজ ভাবনা, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, ফুলিয়া-বয়রা, নদীয়া, পৃষ্ঠা ১৫১)। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

১. শ্রীরামের সঙ্গে চণ্ডাল গুহকের মিতালি কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় বলেছেন, তার পর মহাশ্বেতা দেবীর বলা উচিত হয়নি যে কৃত্তিবাসে অন্ত্যজ ভাবনা অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস লিখছেন, 'চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে/পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে।' মনে রাখার মতো বিষয় এই, কৃত্তিবাস যখন এমন কথা লিখছেন, তখনও আবির্ভূত হননি সাম্যবাদী ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। এমন মানুষের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর 'সাড়ে ছ'আনা' টাইপের মন্তব্য আমাদের ব্যথিত করে। ২. সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সখ্য, বনবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীসের ঈঙ্গিতবাহী? ৩. অন্ত্যজ শবরীর হাতে শ্রীরামচন্দ্র ফল গ্রহণ করছেন, সেই জায়গাতেও কৃত্তিবাস মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণের শিকড় যে কতটা মজবুত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানান বনবাসী কৌমগোষ্ঠীর পুরাণকথাতেও। একটি বিরহোড় লোককথা, 'রাম-সীতা-হনুমান' গল্প; সেখানে শোনানো হয়েছে তেঁতুল আর খেজুর পাতার অভিযোজনের গল্প। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলে গেল। সেখানে তারা 'উথলু' বিরহোড়দের মতো যাযাবরের জীবন কাটাতে লাগল। থাকত পাতার ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে। একবার একটা মস্ত বড়ো তেঁতুলগাছের তলায় ঘর তৈরি করল তারা। সেই সময় তেঁতুলগাছের পাতা ছিল মস্ত বড়ো বড়ো; ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকতে

রানি এলিজাবেথের শেষ কৃত্যে শেখ হাসিনার পাশে দ্রৌপদী মুর্মু

পারত না। রাম ভাইকে বলল, আমরা বনবাসে এসেছি, এখানে কষ্টে থাকতে হবে, আরাম করা চলবে না। কিন্তু এই গাছের ছায়ায় আমরা সুখে আছি, আমাদের গায়ে রোদ বৃষ্টি লাগছে না। এটা তো ঠিক নয়। তুমি তির মেরে পাতাগুলোকে চিরে দাও। লক্ষ্মণ তির মেরে তেঁতুলপাতাগুলোকে চিরে ফালাফালা করে দিল। একটা পাতা চিরে অনেক ছোটো ছোটো পাতা হয়ে গেল। সেই পাতার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল আর রোদের তাপ তাদের দেহে লাগল। সেইদিন থেকেই তেঁতুলপাতা এত ছোটো ছোটো হয়ে গেল। আবার চলেছে তিনজন বনপথ দিয়ে। এবার তারা ঘর তৈরি করল খেজুর গাছের নীচে। সেইকালে খেজুরপাতা ছিল খুব লম্বা আর চওড়া। বৃষ্টির জল আটকে দিত সেই পাতা। রাম আবার ভাইকে তির ছুঁড়তে বলল। লক্ষ্মণ তির মেরে খেজুরপাতাকে সরু সরু করে দিল। সেইদিন থেকে খেজুরপাতা সরু সরু হয়ে গেল। এই গল্পটি বনবাসী সমাজে প্রচলিত অনেকানেক গল্পের মতোই, যা প্রমাণ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি বনবাসী কৌমসমাজেরও উত্তরাধিকার।

শূদ্র-জাগরণের আশা যে স্বামীজীর মধ্যে ছিল, তা তাঁর বাণী ও রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। '...আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে।' শূদ্র জাতির বর্তমান অবস্থার খোঁজ করেছেন তিনি, 'যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য, বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রববো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কী বৃত্তান্ত?' 'যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতের দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কী গতি?'

শূদ্র-জাগরণ কেন এতদিন হয়নি, কেন তারা এখনও পরাধীন তা বলতে গিয়ে স্বামীজী উপলব্ধি করেছেন, 'দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে।...তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিবিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কী হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।' তাই তখন শূদ্র-জাগরণ হয়নি। কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, 'তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' শূদ্রের মধ্যে দু'টি চরমভাব দেখেছেন তিনি, হয় তারা কুকুরের মতো পদলেহক, অথবা নৃশংস; মাঝামাঝি ভাবের বড্ড অভাব ছিল। তবে এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য তারা দীর্ঘদিনের পেষণের ফলে পেয়েছে, 'যুগান্তকারের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস।' চিরকালই তাদের বাসনা নিষ্ফল ছিল; দৃঢ়তা অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই ছিল না।

স্বামীজী শূদ্র-জাগরণের আভাস প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও শাস্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন। তাই লিখেছেন, 'বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল।' আবার এটাও দেখছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল থেকে পতিতেরা সেইসময় শূদ্রকুলে সমানীত হচ্ছে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রসমাজকে যে তুলে ধরতে হবে এবং তা যে এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা, তা তাঁর লেখার মধ্যেই পাই, 'যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার (সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারা অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার— প্রজাপুঞ্জ) হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।' ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে তপশিলি জাতি ও উপজাতির উত্তরণ এক আবশ্যকীয় বাস্তবতা। হয়তো তা না হলেই ভারতবর্ষ অস্থির হতো।

রানি এলিজাবেথের শেষকৃত্যে যুবরাজ চার্লসের সঙ্গে।

দল বেঁধে জনজাতি মহিলারা গান গাইতে গাইতে টুসু বিসর্জন দিতে চলেছে নদীর দিকে।

হিন্দুত্বর জঠরেই জনজাতিদের পূর্ণতা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

"দুন্দুভি বেজে ওঠে
ডিম্ ডিম্ রবে,
সাঁওতাল পল্লীতে
উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা
তন্দ্রা হারায়...।"

এই টুকুতেই অ-জনজাতি 'বাবু' সমাজ জনজাতিদের নিয়ে এক ফ্যান্টাসি তৈরি করেছে। এ আজকের নয়, বহুকালের। এবং সেই জনজাতিদের গভীরভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি না বলেই খুব সহজে একদল মানুষ প্রচারে কর্ণপাত করেন, এবং জনজাতিদের উস্কানোর দায়িত্বও নেন যে ওই সহজ সরল বনবাসী জনগোষ্ঠী হিন্দু নয়। পরাধীন এমনকী স্বাধীনোত্তোর ভারতেও জনজাতি সমাজ নিজেদের বৃহত্তর হিন্দুত্বের অংশ হিসেবেই মানত। ইদানীং এক নতুন রাজনৈতিক প্ররোচনা বহু ক্ষেত্রেই সংগঠিত হচ্ছে যেখানে মূল অ্যাজেন্ডা থাকছে জনজাতিরা এক ভিন্ন ধর্মের মানবসমাজ, তারা হিন্দু নন। এ অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক। জনজাতি সমাজের একাংশও এই দাবি করছেন কিন্তু নৃতাত্ত্বিক সামাজিক ধর্মীয় এমনকী সাংস্কৃতিক স্তরেও যদি গভীর পর্যালোচনা করি, তবে প্রতিটা স্তরেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে, হ্যাঁ ওরা বৃহত্তর হিন্দু ধর্মেরই অংশ। ওরা আচারে লোকাচারে কিছু রীতি রেওয়াজে নিশ্চিতভাবে স্বতন্ত্র কিন্তু গভীর মূলে প্রোথিত রয়েছে বৈদিক সংস্কৃতি, হিন্দু চেতনা। তারা তাদের জীবন এবং সমাজ চর্চার ভিন্ন নামকরণ করতেই পারেন কিন্তু শত রাজনীতিকরণেও এ প্রমাণ করা যাবে না যে তারা হিন্দুত্বের অংশ নন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নেহেরুভিয়ান এডুকেশন সিস্টেমে মনন ও বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বহুলাংশে প্রান্তাবস্থান হয় এবং সেই সুযোগে বাম এবং অতিবাম মনস্ক চিন্তাবিদেরা হিন্দুত্বকে মূলস্রোতের চিন্তা ও চর্চার থেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। Tribal ন্যারেটিভ তাদেরই তৈরি। ড. এস. এন বালগঙ্গাধর রাও, ড. কোয়েনরাড এলস্ট এবং সাই দীপক এই জনজাতিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। আমাদের ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩৬৬(২৫) এবং ৩৪২-এ বিস্তারিত রয়েছে কে বা কারা জনজাতি। হ্যাঁ এই জনজাতিরা indigenous population এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারেও তা প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজ ঔপনিবেশিক সময়ে জনজাতিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে প্রান্তিক করা হয় এবং খ্রিস্টান মিশনারিরা সে সুযোগে তাদের ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে। ড. কোয়েনরাড জনজাতিদের বর্ণনাকালে উল্লেখ করছেন "To traditional Hinduism, Tribes are simply forest-based castes or communities (with both 'caste' and 'tribe' rendering the same Sanskrit term 'Jati'), in contact with the Great Tradition. এর পরে তিনি স্পষ্ট বলছেন—"There never was a clear cleavage between Hindu caste and animist tribes... Tribes from Afganistan to the Gonds of South-Central India have strongly resisted the Muslim invaders... The tribes may have lived on the periphery but it was still within the horizon of Hindu society." ড. বালগঙ্গাধর রাও Culture Differ Differently-তে উল্লেখ করেছেন ট্রাইব একটা কালচারাল 'State'

(যারা একই ভাষা এবং জীবন ও সমাজচর্চাতে অভ্যস্ত)। বেশকিছু indologist-এর ব্যাখ্যায় 'Fundamental unit of the Vedic society was a tribe' অর্থাৎ এটা একটা social unit, এর সঙ্গে পৃথক ধর্মের কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়াও জনজাতিদের এ মাটিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই অবস্থান যা হিন্দুত্বের যুগ ছিল। তাই বিভিন্ন রীতিনীতি ও রেওয়াজে হিন্দু ও জনজাতিদের মধ্যে বহুলাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। প্রকৃতিকে 'মা' হিসেবে পূজার চল জনজাতিদের মধ্যে স্পষ্ট যা হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র। বৈদিক হিন্দুত্ব যেমন অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাসী জনজাতিরাও তাই। জন্মান্তরবাদ হিন্দুদের মধ্যেও যেমন আছে তেমনই জনজাতিদের মধ্যেও রয়েছে।

জনজাতিদের পরবের দিকে একটু চোখ রাখা যাক। ওঁরাওদের প্রসব অনুষ্ঠানে হিন্দুরীতি পরতে পরতে স্পষ্ট। প্রসূতি তার আত্মীয়দের সামনে 'ডুবহা' (রুপোর টাকা), নতুন বীজধান, দূর্বাঘাস, হলুদ দোনাতে এনে রাখে। নবজাতকের আশীর্বাদে থাকে গোরু। সমগ্র জনজাতি সমাজ মনে করে বিবাহ ইহলোক ও পরলোকের যৌথ বন্ধন। পূর্বপুরুষের কথা স্মরণে জল, পান ও ফুল মোরগ উৎসর্গ করে। যা যা জীবনচর্যার অংশ তাতে হিন্দুত্ব আষ্টেপৃষ্টে রয়েছে। জনজাতিদেরও মৃতদেহ দাহ করার রীতি

খড়্গপুর আর ঝাড়গ্রামের মাঝখানে বোম্বে রোডের ওপর গুপ্তমণি মন্দির জনজাতিদের একটা অত্যন্ত জাগ্রত মায়ের মন্দির। মায়ের নিত্য পুজো ও মন্দিরের যাবতীয় পরিচর্যা জনজাতি মানুষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। মন্দিরের গাত্রে হিন্দুত্বের উপস্থিতি জ্বলজ্বল করছে।

আছে এবং তা জলাধার সংলগ্ন স্থানে। ওঁরাওরা দাহের অন্তিমে অদাহ্য অস্থিকে নতুন হাঁড়িতে করে জলাশয়ের ধারে পুঁতে রাখে। ১২ দিন ধরে হিন্দুদের অশৌচের মতোই ওরাও কলাপাতায় খায়। এবং তারপর অস্থি বিসর্জনের পালা। পরিবারের পুরুষেরা চুল কামানোর পর্ব সারেন। নিমন্ত্রিত অতিথিরা এলে উঠানে প্রায় এক ফুট দীর্ঘ গর্ত করে পাহান (পূজা করেন যিনি) পূর্ব দিকে মুখ করে বসেন। আলপনা আঁকা,

দাঁশাই উৎসব

আতপ চাল উৎসর্গ এসব কিছু যে হিন্দু রেওয়াজেরই টুকরো টুকরো অংশ তা নিয়ে দ্বিধা থাকার কথা নয়। নানান উৎসব অনুষ্ঠানেও হিন্দু রীতিনীতির পরিবর্তিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের যখন কালীপূজো ঠিক তখনই জনজাতিদের বাঁধনা পরব। কালীপূজোর পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদে এই পরব হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত থেকে শুরু হয় বাঁধনা পরব এবং শেষ হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন। এ সময় গো-পূজা করা হয়। টুসু পরব আসলে হিন্দুদের সংক্রান্তি উৎসবেরই সমান্তরাল। সংক্রান্তির সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা একটি পাত্রে চালের গুঁড়ো লাগিয়ে তুষ রাখে। পাত্রে ধান, কাড়ুলি বাছুরের গোবর, দূর্বাঘাস, আলু, চাল, আকন্দ, বাসক ইত্যাদি রাখা হয়। এটাই টুসুদেবী। কুমারীরা চিড়ে গুড় বাতাসা টুসুদেবীকে ভোগ নিবেদন করে। লক্ষ্মী পুজো ছাড়া একে কী বলব? টুসু অনুসারে পৌষের পরপর চারদিন 'চাঁউড়ি বাঁউড়ি মকর ও আখান' নামে পরিচিত। প্রথমদিন গোবর দিয়ে উঠান পরিষ্কার, দ্বিতীয় দিনে ধান ভাঙা, তৃতীয় দিনে চাঁচি তিল নারকেল মিষ্টিপুর দিয়ে পিঠেপুলি এবং পরের দিন কুমারীরা টুসু গান করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের

হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমানে পূজা পার্বণের রীতি রেওয়াজের বহিরঙ্গের ভিন্নতা দৃশ্যমান। তাই বলে কি প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ট্যাগ দিতে হবে? খুব বালখিল্য প্রশ্ন নিশ্চিত। যদি তা না হয়, তবে তো হিন্দুদের অনুরূপ পূজাপার্বণে অভ্যস্ত জনজাতিদের ভিন্ন সামাজিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিলেও ধর্মের ভিত্তিতে তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজেরই অংশ।

এখনই বিতর্কের সৃষ্টি হবে কেন তবে সাঁওতালদের কোনো মন্দির নেই? ওদের ধর্মীয় দর্শনের গভীরে ডুব দিতে হবে। রবি ঠাকুরের কথায় ''আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান অনন্তনীলিমা মাঝে...'' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার সৃষ্টি তার জন্য গৃহ নির্মাণের সাহস দেখায়নি সাঁওতাল সমাজ। তাদের বিশ্বাসের ধারণা মাঝি রামদাস টুডুর কথায় বলি—

''আজম পে হো দিশম হড়কো,
সের্যারে মেনায় তাবনা হো,
বাবা ঈশ্বর চান্দো বঙ্গা উনি বাড়ে
বতরায় পে হো।
উনি বাড়ে লাজ্জাও আয় পে হো,
উনি গে দ মেনায় তাবনা হো
দাঃ ভিতিরিরে দাঃ তালারে হো

ক্রুত রে হঁ মেনায় গেয়ার ঞে ঞেল কান গেয়ায়-

নওয়া কথা দ পাতিয়াও পে হো
নওয়া কাথা দ সাবিয়াঃ পে হো।''

যার মানে, এই প্রতিটা আলো কণায়, অনু পরমাণুতে ঈশ্বর উপস্থিত। ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক 'আরণ্যক দর্শন ও সাঁওতালি ঈশোপনিষদ' গ্রন্থে বলছেন, ''শক্তিকে আরাধনা করিতে হইলে প্রয়োজন হয় মাধ্যম বা মিডিয়ামের।'' প্রাচীন বৈদিক সমাজেও এই একই রীতি প্রচলিত ছিল। সেখানেও বলা হচ্ছে—

'একং সদ্‌বিপ্রা বহুদা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতারিশ্বানমাহুঃ'

বেদের এই দেবতাভাব একত্মতার মূল উৎস। এ এক সামগ্রিক চিন্তা যা পরবর্তীতে ম্যাক্সমুলার Henotheism বলে চিহ্নিত করেছেন। দেবতার কোনো ভিন্ন রূপ নেই তিনি পরমেশ্বর রূপে পূজিত। বিশিষ্ট ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে 'হড় সমাজ বঙ্গাবুরুকো' গ্রন্থে সাঁওতালদের আরাধ্য দেব-দেবী বিষয়ে তাত্ত্বিক চর্চা করেছেন। 'বঙ্গা' (দেবতা) সর্বত্র বিরাজমান। 'ডাহার বঙ্গা' অর্থাৎ পথদেবতা, শ শ বঙ্গা অর্থাৎ শস্য দেবতা। যেমন লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর কল্পিত রূপ রয়েছে, সাঁওতালদেরও তেমনই দেবতা অপদেবতার প্রচলিত ধারণা আছে। হিন্দুদের মতোই জনজাতিদের যা যা উৎসব তাতে হয় শক্তির উপাসনা না হলে তাতে কোনো কোনো অর্থনৈতিক উপলক্ষ্য থাকেই। যেমন সারহুল। খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের উৎসব। মূলত এটা ওঁরাওদের উৎসব। এই উৎসবই বিভিন্ন প্রদেশে শুধুমাত্র কৃষি উৎসবে রূপান্তরিত। তা ছাড়াও রয়েছে 'ফাগু' যা সম্ভবত সংস্কৃতায়নের ফসল। যা

বাঁধনা ও টুসু পরব ছাড়াও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার এভাবেই আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে বাড়ির উঠোনে আলপনা দেয় গ্রাম বাঙ্গলার জনজাতি সমাজ।

নববর্ষের সূচক। আদিতে এ ছিল কৃষি নববর্ষ। তাছাড়াও কাচিজিয়ারি—যেখানে অমাবস্যায় তুলসীতলায় শালগাছের পাতায় চালের গুঁড়োর ভিতরে সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়। জাগরণ—যেখানে নতুন বস্ত্রে কুলোয় ধান দূর্বাঘাস যোগে আম্রপল্লবে ধূপ ধুনো দিয়ে গোরুকে বরণ করা হয়। গভীর রাতে গোয়াল ঘিরে থাকে প্রদীপ। যুবকেরা সারারাত গোরুগুলোকে জাগিয়ে রাখে। যাদের ধাঁগড়িয়া বলে। গৃহবধূরা পিটুলি গোলার সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে হোলি খেলে। ভাইফোঁটার দিন তারা গোরুখুঁটা অনুষ্ঠান করে। নির্বাচিত গোরুকে সিঁদুর দিয়ে তাকে ঘিরে চলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। জনজাতিদের সমাজ লোকাচার এক নিজস্ব ছন্দে চলে। তাদের ভাষা ভিন্ন এবং ইংরেজরা ঔপনিবেশিক সময়ে তাদের প্রান্তিক সমাজে নির্বাসিত করেছিল। নিঃসন্দেহে জনজাতিদের পাড়া এখনও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে অবদলিত। তারা এখনও অনেক ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যর শিকার। অস্ট্রিম জনজাতিদের অংশ তারা যদিও এ নিয়েও কিছু বিজ্ঞানসম্মত বিতর্ক হয়, কিন্তু এটা সর্বৈব সত্যি যে সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনজাতিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ স্বাধীনোত্তর ভারতের অনেক প্রদেশে করা হয়েছে। ওদের অর্থনৈতিক ভাবে সবল হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। কখনও ইসলাম তো কখনও খ্রিস্টান যারাই একটু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে তখনই ওরা ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারাও যে হিন্দু সে কথা সমাজের একদল বাবুরাই ওদের মনে করতে দেয়নি। যে জনজাতিরা রোজ বৈদিক পদ্ধতিতে উপাসনা করছে তারা যদি প্ররোচিত হয়ে বলে যে তারা হিন্দুত্বের অংশ নয় তবে তা তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের পক্ষেই বিপজ্জনক। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব যেমন ভিন্ন ভিন্ন সাধনা পদ্ধতি ঠিক তেমনই জনজাতিদের সারনা। কিন্তু তা ভিন্ন ধর্ম নয়, ভিন্ন ভাবনা চর্চা ও দর্শন অবশ্যই। একটা জাতির নিগূঢ় পরিচয় থাকে তার গানে। এইতো শীতকাল আসছে—কান পেতে ঝুমুর শোনার সময় এসেছে। ঝুমুর কী? শ্রীখণ্ডের

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চলছে গরুকে খেলানো (গোরু খুঁটান)।

দামোদর মিশ্র রচিত বৈষ্ণব পদাবলী 'সঙ্গীত দামোদর' থেকে বলাই যায় ''প্রায় শৃঙ্গার বহুলা মাধবীক মধুরামৃদু / একৈব ঝুমুরিলোকে বর্ণীদিনিয়মো দ্বিতা'—অর্থাৎ আদিরসাত্মক গান ঝুমুর। যা শৃঙ্গারে ভরপুর। পদকল্পতরুর পদেও ঝুমুরের উল্লেখ রয়েছে 'যুবতী যুথ শত গায়ত ঝুমরী'—বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদেও ঝুমুর গানের উল্লেখ রয়েছে— 'গওই সহি লোরি ঝুমরি সঅন আরাধনে যাঞা'। যে সকল কবির কথা উল্লেখ হলো তারা বৈষ্ণব ও হিন্দু ধর্মের মিশ্রকালের। তাই ঝুমুরে যে সে প্রভাব বিদ্যমান তা নিয়ে দ্বিমত নেই। ঝুমুরের শব্দ আমাদের বিহ্বল করবে। হর-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ সবাই সেখানে উপস্থিত।

''আকড়া বন্দনা করি, গণেশ শংকর গৌরী,
গুরুর চরণে নমস্তুতি দয়া করো দেবী সরসতি''

কখনও রয়েছে গৌরাঙ্গ বন্দনা—

''হরি হে
গৌরাঙ্গ পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
ছায়া রূপে জগৎ জুড়ায়।
হরি নাম বিলাইতে, পাপি তাপি উদ্ধারিতে,
আসিয়াছে এভব ধারায়।
হো গৌর বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পেতে চাই
ভজ রাঙ্গা চরণ তাহার।''

বহু ঝুমুরের নিদর্শন হারিয়ে গেছে। পদকারেরা সাধারণত নামোল্লেখ করতেন না, তাই স্রষ্টা অধরা। ভাদ্র মাসে করম, ভাদু পরব, বাঁধনা, টুসু সবেতেই ঝুমুর গাওয়া হয়। ভাদরিয়া ঝুমুরের বহু তাল অবলুপ্ত, ঠিক তেমনিভাবে জনজাতিদের ধর্মাচরণের শিকড়ের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের সত্য বাসনা রাজনৈতিক কারণে অনেকটাই অবলুপ্ত। যখন দুর্গাপূজো শুরু হয় ঠিক তখনই ওদের দাঁশাই উৎসব। চলে অশুভ শক্তির দমন। তখন পুরুষরা বাঁশ দিয়ে একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বানায় যার নাম 'ভুয়ং'। তীব্র শব্দে তা বাজিয়ে নাচ গান করে তারা অশুভ শক্তিকে বিদায় করে।

ভুয়ঙের জোরে এবার সেই রাজনৈতিক অশুভ চেতনা বিদায়ের সময় এসেছে—যা সনাতনে বিশ্বাসী জনজাতিদের হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। সাভারকরের হিন্দুত্বেও জনজাতিরা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ। যারা এ মাটিকে মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমির মান্যতা দেয় তারাই হিন্দু। তাই সেই Tribal popular একটা ভিন্ন Race হতে পারে, cultural classification হতে পারে, তাদের অনার্য বললেও তাদের 'তুলসী বিল্ব অশ্বত্থ' অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু non Hindu বলার অর্থ তাদের পক্ষান্তরে দুর্বল করা এবং এ মাটিতে তাদের প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যা একটা জাতির মাথার মুকুট কেড়ে নেয়। ■

হিন্দুদের গাজন জনজাতিদের উৎসব

মলয় চৌধুরী

'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান/এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান। এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন ধরো হাত সবাকার। এসো হে পতিত, হোক আপনীত সব অপমানভার।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায় এই হলো ভারতের সংস্কৃতি। আজ ভারতের সর্বোচ্চ পদাধিকারী একজন জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী মুর্মু। সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। কবিগুরুর কথার ব্যবহারিক স্বীকৃতি। জনজাতিরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মাচার থেকে কখনোই ভিন্ন নন। তাদের পূজাপদ্ধতি, উৎসব পালন সবই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে। সর্বত্রই এক মহামিলনের বার্তা। বহু জনজাতি সমাজ মারাংবুরু, জাহির যান ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করেন। ধর্মীয় মেলাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। উচ্চবর্ণের লোকেরা জনজাতি দেবতা দোয়ারশিনী, চাপাইশিনী, টাড়াইশিনী প্রভৃতির পূজা করেন, ঝাড়খণ্ডের জাতিখেদার মন্দিরে বহু মানুষ মানত করেন ও পূজা দেন। যা কিনা জনজাতিদের দেবতা। জনজাতি পুরোহিত পূজা করেন। পূজা সামগ্রী হিসেবে ধূপ, ধুনা, ফুল, সিন্দুর ও নারকেল ব্যবহার হয়। যা সবই প্রায় হিন্দু পূজার উপকরণ। সেই সঙ্গে ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

চণ্ডী ও মনসার পুজা জনজাতি সমাজের লোকেরাও করে থাকেন। আর শিবের পূজা তথা গাজন উৎসব তো নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রধান উৎসব। ভূমিজ সম্প্রদায় বহু স্থানে বহু দেবতার পূজা করে থাকেন। পুরুলিয়ার জয়পুরে এক সাঁওতাল মহিলা কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলি সবই ধর্মীয় মহামিলনের প্রতিচ্ছবি। জনজাতিদের পূজা সাধারণত তাদের সম্প্রদায়ের লায়ারা পূজা করে থাকেন আবার কিছু স্থানে ব্রাহ্মণ পূজারিও রয়েছে।

সাঁওতাল সমাজে গাছ, পাথর প্রভৃতিকে দেবস্থান রূপে পূজা করা হয়। হিন্দুদেরও অনেক স্থানে গাছ ও পাথরের রূপে দেবতার পূজা করা হয়। পুরুলিয়া শহরের সন্নিকটে এক লৌকিক দেবী 'রায়বাঘিনী' ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হন। বর্তমানে তাঁকে দুর্গার রূপ হিসেবেই পুজা করা হয়ে থাকে। শোনা যায়, বিখ্যাত জনজাতি নেতা বিরসা মুণ্ডা এক ব্রাহ্মণ যোগী পুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বয়ং শিব এমন দেবতা যিনি আসমুদ্র হিমাচল পূজিত হয়ে আসছেন। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সম্প্রদায় শিব, বিষ্ণু, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতির পূজা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। রামের প্রধান সখা ছিলেন বীর হনুমান ও গুহক চণ্ডাল। ঋষি পরাশর ও ধীবর কন্যা সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব যিনি বেদ ও মহাভারত রচনা করেন। ভীমের বনবাসী স্ত্রী হিড়িম্বা শেষ বয়সে হিমালয়ের দেবভূমিতে গমন করেন এবং দেবী দুর্গার তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। আজও সিমলার নিকট তার মন্দির বিদ্যমান।

এসবই প্রমাণ করে ভারত সংস্কৃতির মেলবন্ধনের যা মহান দেশ। উচ্চ-নীচ সবার পরশে পবিত্র করা এই তীর্থ নীরে সকলের সমস্তস্থানে বিরাজমান। এদেশ আজ 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর নীতি অনুসরণ করে মহান এক মিলনক্ষেত্র রূপে বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক জীবন

তথাগত রায়

আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে ইদানীং বেশ কিছুটা আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের এক কুচো রাজনৈতিক নেতার কিছু কুমন্তব্য, যা তিনি করেছিলেন স্পষ্টতই সমবেত মানুষের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য। এই কুমন্তব্য কিন্তু নেতাকে বাহবা দেয়নি, বরঞ্চ জনরোষের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এই পর্যন্তই এই বিষয়টা থাক, কারণ এই রুচিহীন মন্তব্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমরা রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে একটু চর্চা করব।

এই ভদ্রমহিলাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। যখন আমি ত্রিপুরা এবং পরবর্তীকালে মেঘালয়ের রাজ্যপাল ছিলাম তখন তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন। যত দেখেছি ততই তাঁর শান্ত সমাহিত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এই মুগ্ধতাটা পরে গভীর শ্রদ্ধার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যখন জানলাম ব্যক্তিগত জীবনে কী ভয়াবহ বিয়োগান্ত নাটকের মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৫, এই অভিশপ্ত সাত বছর সময়ের মধ্যে তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর স্বামী, দুই পুত্র, একটি ভাই ও মাকে। এর পরেও যে তিনি নিজের সমাহিত ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে জনজীবনে থাকতে পেরেছিলেন তাতে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা যেমন তাঁর কপালে অসীম দুর্ভাগ্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি এক অনন্যসাধারণ চিত্ত দিয়েও পাঠিয়েছিলেন। এরই ফলে আজকে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে চলেছেন দ্রৌপদী মুর্মু।

দরিদ্র এক জনজাতি পরিবারে জন্মেও তিনি ভারতের প্রথম নাগরিক।

১৯৫৮ সালে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রঙ্গপুর অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক সাঁওতাল পরিবারে দ্রৌপদী টুডু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বিরাঞ্চি নারায়ণ টুডু একজন কৃষক এবং সেই সঙ্গে গ্রামের সরপঞ্চ ছিলেন। গ্রামের স্কুলে শিক্ষা। তারপর ভুবনেশ্বরের রমাদেবী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন। ১৯৮০ সালে শ্যামাচরণ মুর্মুর সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়েছিল। পাশ করার পরে দ্রৌপদী প্রথমে সেচ দপ্তরের একটি কার্যালয়ে করণিক হিসেবে কাজ করেন, তারপর রায়রঙ্গপুর শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যালয়ে হিন্দি, ওড়িয়া, গণিত ও ভূগোল বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক থাকাকালীন তিনি কোনো মাসেই পূর্ণ বেতন নেননি, শুধু যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু নিতেন।

মাটির কাছাকাছি জন্ম এবং প্রথম জীবন অতিবাহিত করার ফলে দ্রৌপদীর রাজনৈতিক শিক্ষা মাটি থেকেই হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে পদার্পণ ১৯৯৭ সালে, যখন তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে রায়রঙ্গপুর নগর পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হন। এর পরেই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন এবং ২০০০ সালে রায়রঙ্গপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ওড়িশা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি

সদস্য ছিলেন। এই সময় ওড়িশায় ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজু জনতা দলের জোট ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ওড়িশায় বাণিজ্য ও যাতায়াত দপ্তরের এবং মৎস্য প্রাণীসম্পদ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন। ২০০৯ সালে বিজেপি-বিজেডি জোট ভেঙে যায় এবং ময়ূরভঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে তিনি পরাস্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি ওড়িশা বিধানসভার শ্রেষ্ঠ সদস্য হিসেবে 'নীলকণ্ঠ পুরস্কার' লাভ করেন। এরপর তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় জনজাতি মোর্চার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় জনজাতি মোর্চার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। ২০১৫ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। এই উচ্চপদে তিনিই প্রথম মহিলা। উল্লেখ্য, তিনি যে সাঁওতাল জনজাতির মানুষ সেই জনজাতির একটি বিশাল অংশের বাস এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যেই।

রাজ্যপালদের সাধারণত কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা থাকে না। তবু সংবিধান প্রণেতারা রাজ্যপাল পদটিকে রেখেছিলেন এই কথা ভেবে যে রাজ্যে যদি কোনো সাংবিধানিক সংকট হয় তবে রাজ্যপাল অরাজকতার হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে পারবেন। স্বাধীন ভারতে সংবিধান প্রণেতাদের এই দূরদর্শিতা বারবার প্রমাণ হয়েছে। রাজ্যপাল হিসেবে এই লেখকের অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

মন্ত্রীসভার বৈঠকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে দ্রৌপদী মুর্মু।

রাজ্যপালের ভূমিকায় থেকে দ্রৌপদী মুর্মুর একবার রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এটি ছিল 'পাথালগাদি আন্দোলন'। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন বেশিরভাগ সময়েই রাজ্যে রঘুবর দাসের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ছিল। ঝাড়খণ্ডে বা পূর্বতন বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ আমল থেকেই দুটি আইন ছিল যার বলে কোনো জনজাতি মালিকানার জমি অ-জনজাতিকে হস্তান্তর করা যেত না। রঘুবর দাসের সরকার প্রস্তাব করেছিল যে কোনো জনহিতকর কাজের জন্য স্থানীয় জনজাতি মানুষের সম্মতি নিয়ে জমি সরকার নিতে পারে। কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চার নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। যদিও এই বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গিয়েছিল, তবুও এই দলগুলি রাজ্যপাল শ্রীমতী মুর্মুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যাতে তিনি বিলে সম্মতি না দেন।

বিজেপি নেতা কারিয়া মুণ্ডার একজন দেহরক্ষীকে আন্দোলনকারীরা তুলে নিয়ে যায়, পুলিশের গুলিতে একটি জনজাতির মানুষ মারাও যায়। ফলে শেষ পর্যন্ত এই দলগুলির চাপে দ্রৌপদী বিলে সই করতে অস্বীকার করেন। সরকার তারপর বিল তুলে নেয়।

২০১৭ সালে তিনি ধর্মান্তরকরণ প্রতিরোধ বিলে সই করেন। এই বিল অনুযায়ী কোনো মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বা টাকা বা অন্য কোনো টোপ দিয়ে ধর্মান্তরকরণ করলে তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আর সে মানুষ যদি অনুসূচিত জাতি বা জনজাতির হয় তা হলে চার বছর জেল হতে পারে, সেই সঙ্গে জরিমানা। তিনি ঝাড়খণ্ডে রাজ্যপাল থাকাকালীন জমি অধিগ্রহণ বিলের সংশোধনীতেও সই করেন। এর ফলে জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৫ জুলাই ২০২২ তারখে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে বয়সে নবীনতম, স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করা প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং প্রতিভা দেবীসিং পাটিলের পরে দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি।

(লেখক ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল)

রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের সঙ্গে।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন সঙ্গে।

রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

ভারতের বিস্মৃত মানুষেরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি

অর্জুন মুণ্ডা

ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন ১৫ আগস্টকে ভারত সরকার প্রতিবছর জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছে। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জনজাতীয় উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভারতের কৃতিত্বের সঙ্গে আত্মনির্ভর ভারতের ভাবের বন্ধনই ঘটায়নি, বরং বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থানকে মজবুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অমৃতকালে দেশ স্থির করেছে, ভারতবর্ষের জনজাতীয় উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত রূপ দেওয়া হবে।

সারা পৃথিবীর প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মোট ২৫ শতাংশ বাস করেন ভারতে। যা ভারতবর্ষকে একটি বৈচিত্রপূর্ণ, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যশালী ও বিশাল সংখ্যক জনজাতি যুবসসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। শিক্ষা এবং খেলাধুলার জগতে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, তারা সেগুলি পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করছে। তাদের আত্মোৎসর্গ এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে তারা পদ্ম পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক সম্মানও অর্জন করছে।

সহজাত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তাদের প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্যের জন্য জনজাতি সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবশেষে সবকিছুর পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। দেশের প্রথম জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রপতি সবিস্তারে জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রভূত সুপ্তশক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নিযুক্তি আমাদের সরকারের জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিকেই প্রকট করেছে। তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলি সবই একে একে সমাধানের চেষ্টা চলছে। এটি ভারত সরকারের জনগণকেন্দ্রিক মনোভাবকে প্রকট করে তোলার একটি দৃষ্টান্ত।

আর গত আটবছর ধরে এর চালিকাশক্তি হলো প্রধানমন্ত্রীর রিফর্ম, পারফর্ম ও ট্রান্সফর্মের আহ্বান। এই শক্তি সারাদেশের উন্নয়নের ফসলকে ও সুযোগ সুবিধার সম্পূর্ণরূপে বণ্টনকে

নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রকল্পে অগ্রাধিকার পেয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, কৃষকদের প্রগতি রক্ষা, অসুরক্ষিত স্থানকে সুরক্ষা প্রদান প্রভৃতি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, আমি যখন স্বাধীনতার শতবর্ষের দিকে তাকাই, তখন আমি উপলব্ধি করি যে, জনজাতি সমাজের সম্পূর্ণ উন্নয়ন, তাদের সকলের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তন এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্য দিয়ে তাদের ভারতের মূল সমাজের সঙ্গে একীভূত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত যে উন্নয়নের কথা প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা হলো হোলিস্টিক শিক্ষাব্যবস্থা। এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা যে কোনো সম্প্রদায়, শ্রেণী অথবা দেশকে অগ্রগতিতে সহায়তা করে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে এবং সফল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। আমাদের নীতিগুলির মূল ভিত্তি হলো শিক্ষা, যা জনজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য,

বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে দ্রৌপদী মুর্মু।

তাদের চিরাচরিত ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলির সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজন। জনজাতি সমাজে শিক্ষার প্রগতি বিশেষ করে কমবয়সি মেয়েদের শিক্ষার প্রগতিকে উৎসাহ প্রদান খুবই জরুরি।

এছাড়াও বামচরমপন্থা এই সমস্ত অবহেলিত স্থানগুলিতে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি বড়োসড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্লকস্তরে এই সমস্ত সমস্যাগুলি আলোচনা করা, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এবং আমাদের দেওয়া পাঁচটি স্কলারশিপের মাধ্যমে জনজাতি ছাত্রদের গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা। আমাদের মন্ত্রক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি জনজাতি সম্প্রদায়ের অগ্রগতির ভিত্তিপ্রস্তর হতে চলেছে।

এই মানুষদের ডিজিটাল ক্ষমতা প্রদান থেকে শুরু করে দূরবর্তী স্থানের মানুষদের দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রেও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি— এর আওতায় সবই পড়বে। এছাড়াও আমাদের স্টেট ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এনজিও, সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর জনজাতি জীবন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতি এবং এর নৃতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর মনোনিবেশ করেছে। এদের বিকাশের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই সব সংস্থাগুলির গবেষণা।

২০৪৭ সালে ভারতকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছোতে হবে, শহরে এবং গ্রামে উন্নত সুযোগসুবিধা পৌঁছে দিতে হবে এবং বিশ্বের সবথেকে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এই 'ভিশনের' মূল উপাদানগুলিকে প্রেরণা দেবার জন্য জনজাতি কল্যাণমন্ত্রক উন্নত জীবন-জীবিকা, আয়ের সংস্থান তৈরি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং জনজাতি সমাজের জাতিতত্ত্বমূলক সংস্কৃতির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমাদের এই উদ্যোগের ফলে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজ নিজেদের এই বৃহৎ সমাজের অংশ বলে মনে করছে এবং সমাজকে সংহত করছে। এই মন্ত্রক বিভিন্ন জনজাতির ভাষাকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করার কাজও করছে এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই ভাষার উন্নয়নের চেষ্টাও করে চলেছে।

আগামীদিনে সকলের স্থায়ী উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে। আর এটি হবে এক শক্তপোক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির আধারে— যে সমস্ত অধিবাসীদের অনেক সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। ভারতের সুপ্ত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করতে এবং ভারতকে একটি সমৃদ্ধ ও জনগণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে আমরা সবাই নিযুক্ত হব।

(লেখক ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী)

একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

দ্রৌপদী মুর্মুর উত্থানে আলোকিত জনজাতি সমাজ

কৌশিক রায়

ভারতের প্রথম জনজাতিভুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মু অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাঁর এই কৃতিত্ব স্মরণ করাচ্ছে সাঁওতালি অলচিকি বর্ণমালার উদ্ভাবক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এবং প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক ও ভাষ্যকার পণ্ডিত হরপ্রসাদ মুর্মুর কৃতিত্বকে। ভারতীয় অলিম্পিক হকিতে জনজাতি গরিমাকে বৃদ্ধি করেছেন দিলীপ তিরকে ও ইগনাস তিরকের মতো খেলোয়াড়েরা। তবুও আরও অনেক জনজাতি প্রতিভা এখনও আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত।

বিনীতা সোরেন | নির্মলা পুতুল | দিব্যা হাঁসদা | পূর্ণিমা হেমব্রম | অর্জুন টুডু

দ্রৌপদী মুর্মুর গ্রাম থেকেই উঠে এসেছেন এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে পদকবিজয়িনী, ২৯ বছরের পূর্ণিমা হেমব্রম। ভারতের ভূমিকন্যাদের মধ্যে অন্যতম পূর্ণিমা হেমব্রম, পরবর্তী এশিয়ান গেমসের জন্য পঞ্জাবের পাতিয়ালাতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম আসানার এই অ্যাথলেটটি এখন ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণে অন্যতম আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ্ক। এর আগে জনজাতিদের মধ্যে থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তবে, পূর্ণিমার কৃতিত্ব সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে জনজাতিরা কোনও অংশেই পিছিয়ে থাকতে পারেন না।

পূর্ণিমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অর্জুন টুডুর। তিনি পেশায় একজন ফুটবলার। তাঁদের দুজনের ক্রীড়ানৈপুণ্য অনেকেই চমৎকৃত করেছে। জনজাতি বলয়ে আরও এক নারী, তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। তিনি হচ্ছেন বর্তমানে মুম্বাই নিবাসী চলচ্চিত্র পরিচালিকা দিব্যা হাঁসদা। সাঁওতালদের প্রতি যে একসময় অন্যায় অবিচার করা হয়েছিল— সেটা তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেছেন দিব্যা হাঁসদা। ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ জেলার তালঝারি গ্রামে জন্ম তাঁর। বাবা ছিলেন মিশনারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং পাটনা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক। একজন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয় দিব্যা হাঁসদার। দুজনেই বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে দৃঢ় পদক্ষেপ রাখতে চলেছেন। সাঁওতালদের বিশেষ দেহাকৃতি নিয়ে অনেকের টীকাটিপ্পনীরও জোরালো প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা।

ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার অন্তর্গত কুরুওয়া গ্রামে দুইবার পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন নির্মলা পুতুল। এই জনজাতি নারীটি দুটি কবিতার বইয়েরও রচয়িতা। বইদুটি সাঁওতালি ভাষাতে লেখা। নির্মলার বাবা-মা কৃষিজীবী এবং ইঁটভাঁটার কর্মী। দারিদ্র্য ও সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে নির্মলা আজ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করতে পেরেছেন। সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারকেও প্রত্যক্ষ করেছেন নির্মলা। সেজন্যই তিনি আজ সাঁওতাল গণজাগরণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন নির্মলা পুতুল। সাঁওতালদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার অন্যতম প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, তাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সাধারণ গোত্রভুক্ত শিক্ষার্থীদের মতোই জনজাতির ছেলে-মেয়েরা সমানভাবে বিভিন্ন পরীক্ষাতে কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। অনেক জনজাতি যুবক-যুবতীই আজকাল বিদেশে গিয়ে বি.টেক, বিবিএ, এবং এমবিএ নিয়ে পড়াশোনা করছেন। বর্তমানে শুধুমাত্র তপশিলি উপজাতিভুক্ত তকমা থেকে আরও বাইরে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা। তবে, তাঁদের মধ্যে বাল্যবিবাহের চলটা এখনও রয়ে গেছে। তবুও এগিয়ে চলেছেন জনজাতি মহিলারা। প্রথম জনজাতি নারী হিসেবে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিনীতা সোরেন। তাঁকেও একসময়ে বাল্যবিবাহ করার জন্য পরিবার থেকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আরও বাড়লে তাদের মধ্য থেকে অন্ধবিশ্বাস ও লিঙ্গবৈষম্যের প্রতিবন্ধকতাগুলি ধীরে ধীরে আরও অপসৃত হবে।

স্বামী শ্যামাচরণ মুর্মু ও দ্রৌপদী মুর্মু।

দ্রৌপদী মুর্মুর পারিবারিক জীবন

ড. জিষ্ণু বসু

'দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে, কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।' বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ রাইসিনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনে বসে মানুষটির নিজের কথা বলার জন আক্ষরিক অর্থেই সমগ্র দেশবাসী আজ দেশের প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের তিনি অভিভাবক তারাই তাঁর আপনার জন। তাঁর দুঃখের কথা, হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিজীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলো তো কেবল মেয়ে ইতিশ্রী জানে। তারও তো ছোটো মেয়ে, ব্যাংকের চাকরি, সব সামলে মায়ের কাছে আসা কি সম্ভব?

সেই মেয়েটা ময়ূরভঞ্জের উপেরবেদা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। দৌড়ঝাপ, খেলাধুলা করত। তারপরে একদিন শহরের থেকে এক আধিকারিক এলেন। 'আমি শহরে পড়তে যাব,' হয়তো গ্রামের স্কুলের কোনো মাস্টার মশায়ই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শহরের সেই সহৃদয় ভদ্রলোকের মন গলে গেল। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই মেয়েটিকে।

দ্রৌপদীর তিন সন্তান।

সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত জীবনটা বড়ো অদ্ভুত, দুর্লভ কিন্তু মূল্যহীন। আবার অমূল্যও বলা যায়। লোকে বলে সুখের সময় বিগত দিনের দুঃখের কথা ভাবতে মানুষের খুব ভালো লাগে। আর সবথেকে কষ্টকর হলো দুঃখের সময়ে বিগত দিনের সুখের কথা ভাবা। কিন্তু ব্যক্তি দ্রৌপদী মুর্মু এই দুই সূত্রেরই বাইরে। আজ তাঁর সর্বোচ্চ প্রাপ্তির কথা পরিবারের কোন মানুষটির কাছে বলবেন? মেয়ে ইতিশ্রী। জামাই গণেশ হেমব্রম আর ছোটো শিশুকন্যা এরা ছাড়া আর কেউ যে নেই তাঁর। দ্রৌপদীর স্বামী, তাঁর দুই যুবকপুত্র এক এক করে সবাই তাঁকে ছেড়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।

ময়ূরভঞ্জ জেলার কুসুমি ব্লকের উপেরবেদা গ্রাম। একেবারেই অজপাড়া গাঁ মানে প্রত্যন্ত বনগ্রাম। উপেরবেদা গ্রামে দুটো পাড়া ডুঙ্গুরশাহি আর বড়াশাহি। বড়াশাহির মেয়ে দ্রৌপদী। তখন নাম ছিল পুটি— পুটি খুব ছটফটে ছিল। সেই বনগ্রামের ছটফটে ফড়িঙের মতো কুড়ি গিদরাকে ভুবনেশ্বর শহরে নিয়ে এলেন তিনি। তখন পুটির মাত্র পাঁচ বছর বয়স। হস্টেল জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল পুটির। প্রথম তো নামটাই। ভুবনেশ্বরে স্কুলে ভর্তির সময়ই মাস্টারমশাই পুটির

নাম দিয়ে দিলেন দুরপদি। তারপর ম্যাট্রিকুলেশন মানে বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন, ওড়িশার অ্যাডমিট কার্ডে নাম এল দ্রৌপদী। রাইরঙ্গপুর জেলার বাইড়ামোসি মহকুমার কুসুমি ব্লকের উপেরবেদা গ্রামের মেয়ে পুটি ভুবনেশ্বরের ইউনিট-টু গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করল।

দ্রৌপদী মুর্মুর বাবা ছিলেন বিরাঞ্চি নারায়ণ টুডু। তিনি ছিলেন গ্রামের 'মাঝি হারাম।' সাঁওতালি সমাজে নিজেদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রধান হন মাঝি হারাম। দ্রৌপদীর ঠাকুরদাদা মশায়ও ছিলেন মাঝি হারাম। ছুটি পেলেই গ্রামে ছুটে যেতেন দ্রৌপদী। আর বিয়ে কী সহরায়, সব উৎসবে, পরবে নাচের দলের নেতা তিনি। গ্রামে কোনো মেয়ে তো এর আগে কলেজে পড়েইনি। দ্রৌপদী এখন রমাদেবী উইম্যান্স কলেজের ছাত্রী। মাঝি হারাম বাপের বিটির মধ্যেও নেতা নেতা ভাব আছে বটে। কেউ অন্যায়, অপরাধ করলে প্রতিবাদের কণ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন দ্রৌপদী। রাজনীতি বা সামাজিক কাজ করার মনটা হয়তো তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামে রেকর্ড করলেন দ্রৌপদী।

দ্রৌপদীর অমন ডাকাবুকো প্রতিবাদী স্বভাবটাই বোধহয় মনে ধরেছিল অত্যন্ত শান্তশিষ্ট শ্যামচরণের। প্রেমে পড়ে গেলেন শ্যামচরণ। ১৯৮০ সালে বিয়েও হয়ে গেল। দ্রৌপদী তখন সেচ দপ্তরের জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। সবে বছরখানেক হলো চাকরি পেয়েছেন। খুব সুখী ছিল মুর্মু দম্পতি। বিয়ের সময় উলভোর মানে আমগাছের ডাল দিয়ে বরকে খেলার ছলে মারে সাঁওতাল মেয়ে। যাতে সারাজীবন স্বামী বশে থাকে। কিন্তু শ্যামচরণ এমনিতেই খুব দায়িত্ববান আর শান্ত। বাবা হওয়ার পরে যেন আরও পারিবারিক হয়ে উঠলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা ব্যাংক থেকে বাড়ি ফিরেই বাচ্চাদের নিয়ে মেতে থাকতেন। লক্ষ্মণও খুব ছটফটে আর দুরন্ত।

কিন্তু দ্রৌপদী এবার এক বড়ো সিদ্ধান্ত নিলেন। সেচ দপ্তরের সরকারি চাকরি করে বাচ্চাদের ঠিকঠাক সময় দিতে পারছেন না। তাই ১৯৮৩ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলেন। পড়াতে সব সময়ই তার ভালো লাগত। ছেলে-মেয়ে একটু বড়ো হওয়ার পরে ১৯৯৪ সালে রায়রঙ্গপুরের অরবিন্দ ইন্টিগ্রাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সংস্থায় শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সেখানে হিন্দি, ওড়িয়া, অঙ্ক আর ভূগোল পড়াতেন। ১৯৯৭ সালে দ্রৌপদী মুর্মু রায়রঙ্গপুর নগর পঞ্চায়েতে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। জিতেও গেলেন তিনি। তারপরেই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন। সেই শুরু হলো তাঁর অন্য এক জীবন। মানুষের জন্য মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন তিনি। মানুষ উজাড় করে তাঁকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়েছেন, প্রবীণরা আশীর্বাদ করেছেন। কেবল তাঁর জীবন থেকে বিশ্রাম চলে গেছে, ছোট্ট অখ্যাত গৃহকোণ হারিয়ে গেছে। সহরায়, বাহা, করম, মাহমোর মাঘসিম বা দাসিনের পতি-পুত্র-কন্যা নিয়ে যে সংসার সেটাই যেন নিয়ে নিলেন মারাংবুরু। ২৫ অক্টোবর, ২০০৯ সাল। বড়ো ছেলে লক্ষ্মণ তখন ২৪ পূর্ণ করে

নাতনি ও কন্যার সঙ্গে।

সবে ২৫শে পড়েছে। হঠাৎ কী হলো, একদিন হঠাৎ বিছানায় অচৈতন্য হয়ে গেল। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া নেই। লোকজন এল, ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার দেখে বললেন, লক্ষ্মণ আর নেই। পার্টির সকলে এলেন, অনেক সন্ত্বনা দিলেন। কিন্তু মায়ের মন কী কোনো প্রবোধ মানে?

রাজনৈতিক ব্যস্ততায় মনের দুঃখ কি চাপা যায়? সারাদিনের শেষে রাতে দুজন মানুষ নির্জনে কাঁদেন। চার বছরও পূর্ণ হলো না হঠাৎ একদিন পথদুর্ঘটনার খবর, ২ জানুয়ারি ২০১৩ সব শেষ! মায়ের কোল খালি করে চলে গেল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। পরপর দুটি ছেলের মৃত্যু শ্যামচরণকে একেবারে স্তব্ধ করে দিল। এমনিতেই শান্ত মানুষ। আরও যেন শান্ত হয়ে গেলেন। কোনো কথায় উত্তর দেন না, যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। কখনো কাঁদেন, কখনো নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দেন দিনকতক। ছোটো ছেলের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে যাওয়া মানুষটি বছর দুয়েক বেঁচেছিলেন। ২০১৪ সালে একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। দিনটা ২০১৪ সালের ১ আগস্ট।

সব হারানো দুই মা-মেয়ে। কান্নাও যেন

দ্রৌপদী মুর্মুর কন্যা ও জামাতা।

শুকিয়ে গেছে। ইতিশ্রী ছোটো থেকেই মায়ের হাতের নুডুলস খেতে খুব ভালোবাসতো। পুনে থেকে পড়া শেষ করে মেয়ে ফিরে আসতেই বিয়ে ঠিক করে ফেললেন মা। ২০১৫ সালের ৩ মার্চ বিয়ের দিন ঠিক হলো। পাত্র গণেশ চন্দ্র হেমব্রম।

এই সবে উপেরবেদা গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। মহামহিমের গ্রামের জন্য টাটা পাওয়ার কোম্পানির থেকে তড়িঘড়ি পোস্ট পুঁতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। তাও ডুঙ্গুরশাহি পাড়াতে লাইন যায়নি। আর গেলেই-বা কী? সারদিন তো বিদ্যুৎ থাকে না! রায়রঙ্গপুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব খারাপ রাস্তা ধরে যেতে হয় উপেরবেদা গ্রামে। খড় আর খাপরার ছাউনি, সাঁওতাল গ্রামের চেনা ছবি।

গ্রামের সঙ্গে এখনও নিয়মিত যোগ আছে বলেই হয়তো মন শক্ত করে লড়াই করতে পেরেছেন তিনি। স্বামী আর দুই পুত্রকে হারাবার ভীষণ কঠিন সময়েই তিনি হারিয়েছেন তাঁর মা আর নিজের ছোটো ভাইটিকে। এই মৃত্যুমিছিলে তাঁর জীবনে এক দিদি এলেন। তিনিই তাঁকে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করলেন। নিয়মিত ধ্যান করতে শুরু করলেন তিনি। সে আর এক নতুন জীবন। রাজনৈতিক কাজকর্ম, রাজ্যপালের দায়িত্ব সব কিছুর সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত হয়ে গেল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি হরোহপরানি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী। মানুষ যেমন ছেঁড়া পুরাতন কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে। তেমনই মনুষ্যশরীর জীর্ণ হয়ে গেলে আত্মা এক শরীর ছেড়ে নতুন শরীর গ্রহণ করে। শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই অমোঘ কথা ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু একটু করে মনে প্রবেশ করে, ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়। দেহের মধ্যে মন, মনের ভেতরে যে সে যেন বোঝে 'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু। আমরা অবোধ, অন্ধ ময়ায় তাই তো কাঁদি প্রভু।' কিন্তু অবোধ মন কি এত তত্ত্ব, এত যুক্তি বোঝে? মন কি রায়রঙ্গপুরের সেই ভরা সংসারটার কথা, দুটো তরতাজা তরুণ শাল গাছের মতো ছেলের কথা ভুলতে দেয়? আর সেই শান্ত মানুষটা, যাকে সেদিন 'উলডোর' দিয়ে মারার সময় চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল। কী সরল, কত বিশ্বাসে ভরা চোখ দুটো!

সব রূপকথার গল্পের শেষের লাইনটি থাকে, 'এর পরে তারা সুখেশান্তিতে বসবাস করতে থাকল'। আর বিয়োগান্তক কাহিনির শেষে থাকে এক অপূর্ণ স্বপ্ন এক অনন্দ হাহাকার। কিন্তু গল্পের থেকে বাস্তব আরও বেশি অবাক করার মতো হয়। কারণ সে কাহিনি তো ভগবান স্বয়ং লেখেন। তাই আজকে রাইসিনা হিলে যিনি আছেন, তাঁর জীবনকাহিনি চিরচরিত গল্পের অনেক বাইরে। সে কাহিনির শেষ লাইনটি লেখা আমার সাধ্যে কুলোবে না। ■

দ্রৌপদী মুর্মুর বাড়ি।

ধরাশায়ী ভারতীয় রাজনীতির অভিজাততন্ত্র

ড. তরুণ মজুমদার

ভারতীয় উপমহাদেশের বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে বিগত সাত দশকের বেশি সময় ধরে ‘এক আকাশ হোক সবার ছাদ, মুছে যাক দেওয়ালের ভাগ’— এই আদর্শের বাস্তবায়ন এক অলীক কল্পনা ছিল মাত্র। একাত্ম মানবদর্শনকে সামনে রেখে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত উপেক্ষিত জনজাতি সমাজের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক এবং সমষ্টিগত আস্থাবর্ধনের শুভ প্রয়াসকে যখন বাস্তবের মাটিতে প্রায়োগিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে ঠিক তখনই উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরানো কংগ্রেস ও বাম ঘরানার তথাকথিত লিবেরাল অভিজাত সমাজ নিজেদের মৌরসিপাট্টা হারানোর আশঙ্কায় ব্যক্তিগত কুৎসিত আক্রমণে নেমেছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার দ্রৌপদী মুর্মুকে অশুভ মতাদর্শের প্রতিনিধি বলে মন্তব্য করেছিলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধি উদিত রাজ এক টুইট বার্তায় লেখেন, ‘কোনো দেশের দ্রৌপদী মুর্মুর মতো রাষ্ট্রপতি পাওয়া উচিত নয়, চামচাগিরিরও সীমা আছে।’ লোকসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা অধীর চৌধুরী রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপত্নী বলে অসম্মান করেন। সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে রাষ্ট্রপতির চেহারা নিয়ে কদর্য মন্তব্য করে তৃণমূল নেতা অখিল গিরি বলেন, ‘তোমার রাষ্ট্রপতিকে দেখতে কেমন বাবা?’ তোমার রাষ্ট্রপতি! অর্থাৎ দেশের প্রথম জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা রাষ্ট্রপতিকে সকল ভারতীয়র রাষ্ট্রপতি ভাবতে পারছেন না এরা। এখানেও সেই তোমার- আমার। পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আসীন ব্যক্তিদের উপর ব্যক্তিগত কদর্য আক্রমণ এই প্রথম নয়। দলিত সমাজের প্রতিনিধি রামনাথ কোবিন্দকে এনডিএ সরকার দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করলে কংগ্রেস নেতা উদিতরাজ তাকে ‘কালা ও বোবা দলিত’ বলে অসম্মান করেছিলেন। ঘাঞ্চি তেলি সম্প্রদায়ভুক্ত এক নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন তখন কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার মোদীকে ‘নীচ আদমি’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। বামপন্থী তথাকথিত অভিজাত সাংবাদিক মালিনী পার্থসারথী মোদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে চান না যে নাকি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না।

নীতির থেকে সুপারিশকে প্রাধান্য দেওয়া তথাকথিত এলিট সমাজ দ্বারা পরিচালিত এত দিনের ইকোসিস্টেম দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিতে পারছে না। ভারতীয় সমাজকে উল্লম্বভাবে বিভাজিত করে রেখে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উপমহাদেশীয় জনগণকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজেদের status quo আর বজায় রাখতে পারছেন না। তাদের গড়ে তোলা সংগঠিত নৈরাজ্যের মডেল বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে

জগন্নাথ ধামে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন।

ধূলিসাৎ হতে চলেছে। চলমান প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাজনীতির যে সার্বিক সামাজিকীকরণ চলছে তাতে এই অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। বংশানুক্রমে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাজনীতি এবং সাংবাদিকতার কারবারিরা সমাজের একেবারে নীচু তলার মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ্য করতে পারছেন না। আর এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দুর্নীতিগ্রস্ত ফ্যাসিস্ট পরিবারের উচ্ছিষ্টভোগী নাক-উঁচু পরিচারকদের বা স্তালিনবাদী বাস্তুতন্ত্রের দাসেদের সমষ্টিগত হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ব্যক্তিগত কুৎসিত আক্রমণের মধ্যে দিয়ে।

প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি। এই জনসংখ্যার প্রায় নয় ভাগ মানুষ বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এই প্রান্তিক মানুষদের পরিচয়-স্বীকৃতিতে সমস্যা আছে। তাদের বাসভূমিতে ক্রমাগত তাদেরকেই সংখ্যালঘু করে তোলা হচ্ছে, এদের অধিকার চেতনাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে দমনের রেওয়াজ চলে আসছে এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মাটির নীচের খনিজ এবং মাটির উপরের প্রাকৃতিক সম্পদে কর্পোরেট থাবা বেড়েই চলেছে। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই বঞ্চিত এই সমাজের কাছে অনেক সময় নকশাল মতের আবেদন মান্যতা পেয়ে যায়। প্রশাসন এবং বঞ্চিত সমাজের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে যে

রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে পূজানুষ্ঠানে।

শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক যুবসমাজকে বিকৃত মাওবাদে আকৃষ্ট করে তোলে। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'— এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই সকল অঞ্চল ধীরে ধীরে রেড করিডরে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। ফলে সরকার চাইলেও এ সকল অঞ্চলের সার্বিক উন্নতিকল্পে জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করে উঠতে পারে না। এরূপ পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়াটা রেড করিডরভুক্ত এলাকার জনজাতির চোখ খুলে দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের অবহেলিত উপেক্ষিত চোখগুলির উপর থেকে প্রবঞ্চনার ছানি কাটতে শুরু হয়েছে। তারা ক্রমশ বুঝতে পারছেন যে বন্দুক ছাড়াই তারা ভারতবর্ষের হর্তাকর্তা হতে পারেন, এর জন্য মাওবাদী কমরেড হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর ঠিক এখানেই বেইজিঙের দাস এবং নাক-উঁচু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক কুলিদের গাত্রদাহ, কারণ তাদের দীর্ঘলালিত ইকোসিস্টেম ক্রমশ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে।

তাছাড়া সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে জনজাতি সম্প্রদায়গুলিকে আলাদা করার প্রচেষ্টা বিদেশি ধর্ম প্রচারকদের দীর্ঘদিনের প্রচারণার অংশ। কিছু রাজনৈতিক নেতাও এই কনসেপ্ট ক্রমাগত প্রচার করে চলেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছিলেন, 'আদিবাসীরা কখনো হিন্দু ছিল না এবং তারা কখনো হবেও না।' এই উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ১১ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড বিধানসভা জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য 'সারনা' নামক একটি পৃথক ধর্মীয় কোড সৃষ্টির প্রস্তাব পাশ করেছিল। স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম প্রভৃতি জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দু নন। তাই তাদের আলাদা ধর্মের ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পেট্রো-ডলারে পুষ্ট অংশটি তাদের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ন্যারেটিভ নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদের উদ্দেশ্য মূলত জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের ভুল বুঝিয়ে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা- ওরার প্রাচীর তৈরি করা যাতে বিকৃত শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করা যায় এবং একইসঙ্গে জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষগুলিকে তাদের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্যগত বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মান্তর মাফিয়াদের সুযোগ করে দেওয়া যায় যাতে তাদের ধর্মান্তরিত করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই অপকৌশলটি ইতিমধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আমাদের দেশে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুরের মতো উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। এই প্রেক্ষিতে দ্রৌপদী মুর্মুর মতো একজন সাঁওতাল হিন্দু উপজাতীয় মহিলার রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হওয়াটা, 'জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দু সমাজের অংশ নয়'— এই বিকৃত ন্যারেটিভের উপর এক চরম ধাক্কা। দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হওয়ায় জনজাতি ধর্মান্তর বহুলাংশে হ্রাস পাবে। হিন্দু ও হিন্দুত্ব থেকে জনজাতিদের বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াস ধাক্কা খাওয়াতেই হিন্দু বিদ্বেষী সেকুলার লবি সব কিছু হারানোর ভয় এবং চরম হতাশা থেকেই ব্যক্তিগত কুৎসিত আক্রমণে নেমেছে। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া ভণ্ড সেকুলাররা যতই কুৎসা ও চিল চিৎকার করুক না কেন, জনতা জনার্দন কিন্তু বুঝতে পারছেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং ডেমোগ্রাফিক স্টেবিলিটির স্বার্থে রাষ্ট্রপতি পদে দ্রৌপদী মুর্মুর অভিষেক একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরমু ও জনজাতি সমাজের অনুভূতি

ডাঃ চুনারাম মুরমু

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল ২০২২ সালের ২১ জুলাই। দ্রৌপদী মুরমু ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন। এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের রাইসিনা হিলে পর্দাপণ ঘটল। শ্রদ্ধেয় দ্রৌপদী জনজাতি সম্প্রদায়ের সাঁওতাল সমাজের ১১ কোটি মানুষের একজন প্রতিনিধি এবং সেই সঙ্গে আধুনিক ভারতের পিছিয়ে পড়া মানুষেরও প্রতিনিধি।

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতের ১১ কোটি জনজাতি মানুষের হৃদয়ে এক আনন্দ ও ফুর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যেদিন তিনি রাইসিনা হলে শপথ নিয়েছিলেন। আট থেকে আশি বছরের মানুষ সেদিন বিভিন্ন ভাবে দিনটাকে পালন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ আবেগে, আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন। কোথাও কোথাও চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিশাল মিছিল পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নেওয়া জনজাতিরা ধামসা, মাদল, নাগরা, ঢোল, করতাল নিয়ে চিরাচরিত পোশাক পরিচ্ছদ পরে নাচ ও গান করেন। এইরকম সৌভাগ্য ভারতবর্ষে কোনওদিন হবে তা কোনও জনজাতি নেতা-নেত্রী কেন, ভারতবর্ষের কোনো মানুষই ভাবতে পারেনি।

এই প্রথম ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জনজাতি সম্প্রদায়ের একজন মহিলা এবং তিনি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি। তারপর থেকেই জনজাতি সমাজের মধ্যে চরম উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে এতে জনজাতি সমাজ খুবই খুশি। বিভিন্ন জনজাতি সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপেও অভিনন্দন বার্তা দেওয়া হয়েছে। এ এক অভূতপূর্ব আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন জায়গায় উৎসবও পালন হয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জনজাতি সমাজের অবদান আজও উজ্জ্বল এবং তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বাবা তিলকা মাঝি, সিদু মুরমু, চাঁদ-ভৌর, কুলো, ঝানোর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ধাবতী আবা ভগবান বিরসা মুণ্ডার ইংরেজদের

বিরুদ্ধে উলগুলানের ডাক, নাগাল্যান্ডের রানি মা-গাইদিনল্যু, গাণ্ডোয়ানার রানি দুর্গাবতী, কেরলের কেশরী তলক্কল চন্দ, সোমনাথ রক্ষক বেগড়া ভীল, ভীলবীর তাঁতিয়ামামা, বীরকোদন চক্রবিশোই, বীর বুধু ভকত, ওরাঁও বীর জতরা ভকত, ভীলবালক দুদ্ধার বলিদান, অন্ধ্র প্রদেশের অল্লুরী সীতারাম রাজু, অসমের খাসি নায়ক ইউ, তীরথ সিংহ— স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে জনজাতি সমাজের বীরগাথাকে স্মরণ রাখার জন্য জনজাতি সমাজের রাষ্ট্রপতি বেছে নেওয়া এক সুদূর দূরদর্শিতার প্রয়াস যার মাইলস্টোন বহুদূর অবধি প্রেথিত হলো জনজাতি সমাজে। জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি খুবই নমনীয়। পৃথিবীতে দীর্ঘকাল টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় আদর্শের। এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে শ্রীমতী দ্রৌপদী মুরমু দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক ও গরিব মানুষের জন্য কাজ করেছেন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ও শহরেও। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবন হয়ে আত্মপ্রকাশ করাটা এক অভাবনীয় বিষয়।

তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবন ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আমরা আশাবাদী, তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন। পিছিয়ে পড়া জনজাতি সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা-সাথ সবকা-বিকাশ, সবকা বিশ্বাস', 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এবং জনজাতি সমাজের মহিলা রাষ্ট্রপতি— মহিলাদের ক্ষমতায়ণের পক্ষে সামনের সারিতে নিয়ে আসার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা, যার সুদূরপ্রসারি ফল জনজাতি সমাজের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসবে।

(লেখক বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি)

সাক্ষাৎকার

দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হবার খবরে খুশি জনজাতি সমাজ

গত বছর ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের যে ছ'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেছেন মালদা জেলার গাজোলের জনজাতি সমাজের ***কমলী সোরেন*** *তাদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক কাজের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই পদ্মশ্রী পুরস্কার দেন। স্বস্তিকার প্রতিনিধি তরুণকুমার পণ্ডিত কমলী সোরেন, জনজাতি সমাজের গুরুমা হিসেবে পরিচিত* ***রেখা হেমব্রম,*** *মালদা জেলার হবিবপুরের বিধায়ক* ***জুয়েল মুর্মু*** *এবং মালদা উত্তরের সাংসদ* ***খগেন মুর্মুর*** *সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের বিষয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।*

প্রশ্ন : একজন জনজাতি প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কেমন লাগছে?

জুয়েল মুর্মু : খুবই খুশি হয়েছি। এই প্রথম স্বাধীন ভারতে জনজাতি সমাজের একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করে মোদী সরকার সম্মানিত করলেন, তার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রশ্ন : জনজাতি সমাজ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মু নির্বাচিত হওয়ায়, এটা কীভাবে দেখছেন?

জুয়েল মুর্মু : একবার রামনাথ কোবিন্দ এস সি সমাজের মধ্যে থেকে এবং এবার এস টি সমাজ থেকে দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হওয়াতে পিছিয়ে পড়া সমাজকে মোদী সরকার যে সম্মান জানালেন এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : একজন জনজাতি বিধায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

জুয়েল মুর্মু : জনজাতি সমাজের মধ্যে এখনও অনেক অন্ধবিশ্বাস, নেশা ও ডাইনি প্রথা রয়েছে। এছাড়াও তারা আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল। তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

প্রশ্ন : দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, একজন জনজাতি মহিলা হিসেবে আপনার কেমন লাগছে?

কমলী সোরেন : দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করে জনজাতি সমাজকে সম্মান জানানোর জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। যেহেতু আমিও জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রশ্ন : এই ঘটনায় সাধারণ জনজাতি মহিলারা কতটা উদ্বুদ্ধ?

কমলী সোরেন : জনজাতি সমাজের মানুষ পিছিয়ে পড়া সমাজের একজন সাঁওতাল মহিলাকে দেশের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত করায় আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ধামসা মাদল বাজিয়ে। লেখাপড়া শিখে জনজাতি মহিলারাও যে উচ্চ পদে যেতে পারেন, সেটা বুঝতে পেরেছে।

প্রশ্ন : এর ফলে জনজাতি মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়বে কি?

কমলী সোরেন : অবশ্যই বাড়বে। সামাজিক দিক থেকে জনজাতি

মহিলারা যেমন গর্ব অনুভব করবে এবং সনাতন ধর্মের বলে মনে করবে তেমনি রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁরা আরও বেশি করে সচেতন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন : মোদী সরকারের আমলে জনজাতি সমাজকে আমরা পুরোভাগে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে রামনাথ কোবিন্দ তারপর দ্রৌপদী মুর্মু, এই পরিবর্তন আপনি কীভাবে দেখছেন?

কমলী সোরেন : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দিল্লিতে শপথ গ্রহণের দিন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার মতো আরও অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এজন্য আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে করি এবং পিছিয়ে পড়া জনজাতি সমাজকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য মোদী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রশ্ন : একজন জনজাতি মহিলা হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

কমলী সোরেন : কিছু সংখ্যক মানুষ জনজাতি সমাজকে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সারনা ধর্ম বলে আলাদা করতে চাইছেন, এতে যেন আমাদের রাষ্ট্রপতি স্বীকৃতি না দেন।

আর আমাদের পিছিয়ে পড়া জনজাতি মহিলারা যাতে অন্ধবিশ্বাস মুক্ত হয়ে আরও বেশি লেখাপড়া শিখতে পারে, তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন।

প্রশ্ন : দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। একজন জনজাতি মহিলা হিসেবে আপনার কেমন লাগছে?

রেখা হেমব্রম : আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে একজন জনজাতি মহিলা এতবড়ো পদে যাবেন। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

প্রশ্ন : জনজাতি মহিলা সমাজ কতটা উদ্বুদ্ধ?

রেখা হেমব্রম : অনেকটাই উৎসাহিত হয়েছে এবং পড়াশোনায় আরও বেশি করে মনেযোগী হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে জনজাতি সমাজের মধ্যে থেকে এত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়া নিয়ে।

প্রশ্ন : এর ফলে জনজাতি মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়বে কি?

রেখা হেমরম : নিশ্চয় বাড়বে। জনজাতি সমাজের কিছু মানুষ প্রলোভনে খ্রিস্টান হচ্ছে কিন্তু সনাতন ধর্মে থেকেও যে দেশের সর্বোচ্চ পদে যাওয়া যায় এটা তারা বুঝতে পেরেছে। রাজনৈতিক ভাবেও তাঁরা যথেষ্ট সচেতন হচ্ছে।

প্রশ্ন : মোদী সরকারের আমলে জনজাতি সমাজকে আমরা পুরোভাগে দেখতে পাচ্ছি। দ্রৌপদী মুর্মু সমেত অনেকেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন। এই পরিবর্তন আপনি কেমনভাবে দেখছেন?

রেখা হেমব্রম : পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের উপরে উঠিয়ে মোদী সরকার সঠিক কাজই করেছেন। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক অন্ধবিশ্বাস রয়েছে আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা আমাদের অনেককেই ধর্মান্তরিত করছে এবং সারনা ধর্ম প্রচার করছে। আমার মনে হয় এবার এর পরিবর্তন হবে।

প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতির নিকট একজন জনজাতি মহিলা হিসেবে আপনার প্রত্যাশা কী?

রেখা হেমরম : অন্ধবিশ্বাস মুক্ত হয়ে জনজাতি সমাজ যাতে আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে আরও উন্নত হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন : জনজাতি সমাজ থেকে একজন মহিলা দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ায় আপনি জনজাতি সমাজের একজন সাংসদ হিসেবে কী অনুভব করছেন?

খগেন মুর্মু : এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পিছিয়ে পড়া সমাজকে উপরে তুলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনজাতি সমাজকে মর্যাদা দানের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সামনে একটি বড়ো দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমি অভিভূত, আমাদের সমাজকে এতটা সম্মান দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতির কাছে আপনার প্রত্যাশা কী?

খগেন মুর্মু : আমি নিশ্চিত তিনি দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে তথা জনজাতি সমাজকে সবদিক থেকে উন্নতি করতে সচেষ্ট হবেন।

জনজাতি সমাজের উত্থানে সারা দেশে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সেবাকাজ	
শিক্ষা ঃ-	
ছাত্রাবাস (বালক)	১৭৯
ছাত্রাবাস (বালিকা)	৫৪
উচ্চ মাধ্যমিক/মাধ্যমিক/প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৯
একল বিদ্যালয়/শিশুশিক্ষা কেন্দ্র	১৯৫৭
শিশু সংস্কার কেন্দ্র	৯৫৩
নৈশ পাঠশালা	৪৭
নিঃশুল্ক কোচিং সেন্টার	৬
পুস্তকালয়	৪০
স্বাবলম্বন ঃ-	
কৃষি প্রশিক্ষণ/উদ্যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৩০
স্বনির্ভর গোষ্ঠী	৩৩৯৮
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র	৫৯১
স্বাস্থ্য ঃ-	
চিকিৎসা কেন্দ্র	৬৯
আরোগ্য রক্ষক	৪১৮৮
হাসপাতাল	১০
চিকিৎসা শিবির	৩৪১
সংস্কার ঃ-	
খেলকুদ কেন্দ্র	২১০৪
শ্রদ্ধাজাগরণ কেন্দ্র	৫৪২৬
লোককলা মণ্ডল/গতিবিধিযুক্ত গ্রাম	১১১৮
মোট প্রকল্প	**১৯৩০১**
মোট প্রকল্প স্থান	**১৫৪৯৪**

দ্রৌপদী প্রসঙ্গে মণিকা বেসরা

একসময় খবরের শিরোনামে বিরাজ করতেন। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের নিকট বনবাসী গ্রাম 'খোয়া নাকর'। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার পাকা রাস্তা, কেন্দ্র সরকারের সজল ধারার নলের জল, সঙ্গে বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে মেহেন্দিপাড়া গির্জা। সেবার আড়ালে গরিব বনবাসীদের ধর্মান্তরিত করার ঘাঁটি। মাদার টেরিজাকে সন্ত উপাধি দেবার জন্য অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ চাই। সেই জন্য মণিকা বেসরাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁকে বলা হয় পেটের টিউমার অনেক চিকিৎসার পরও না সারলে টেরিজার ছবির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলেই নাকি টিউমার ভালো হয়ে যাবে। মণিকাদিদিকে ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে ভ্যাটিকান সিটি নিয়ে যায়। পাদরিরা যা বলে সে মাথা নাড়ে, আর সেটাকেই প্রমাণ হিসেবে সন্ত উপাধি দেওয়া হয়। বাস্তবে মণিকাদিদি না ইতালি না ইংরেজি বুঝতে পারেন। সেই কাজ হবার পর তাকে বাড়ি পৌঁছাবার দায় সারে চার্চ কর্তৃপক্ষ। আমরা যখন তার বাড়ি গেলাম, তখন তিনি বাড়িঘর ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। আমরা বলাতে এসে বসলেন। হাতে এখন শাখা বিদ্যমান। নিজের জমিতে খেটে খান। আমরা স্বস্তিকার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ছবি দেওয়া সংখ্যা হাতে তুলে দিই। বনবাসী সমাজের গুরুমা রেখা হেমব্রম বা সদ্য পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কমলি সোরেনকে চেনেন না। বনবাসী সমাজের উত্থানের কথা বলা হয়। বর্তমানে তাদের এক ছেলে কলকাতায় পড়াশোনা করে, তার খরচ চার্চ বহন করে। কিন্তু বাবা-মাকে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। এতকিছু করার পর সেই গ্রামে ৪৫ ঘর বনবাসীর মধ্যে মাত্র ৫ ঘর ধর্মান্তরিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকার : গৌতম সরকার।

চোদ্দ বছর শ্রীরামচন্দ্র জনজাতিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন

হীরক কর

তথাকথিত হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে জনজাতি সমাজের দেব-দেবীর পার্থক্য আছে। জনজাতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে প্রকৃতি, বিশেষ করে পাহাড়-পর্বত-অরণ্য, অরণ্যের পশুপাখি ইত্যাদি। চাষবাস বর্তমানে অধিকাংশ জনজাতি সমাজের জীবিকা হলেও অনেকে এখনোও যাযাবর ও শিকারনির্ভর। সিং, বোঙ্গা, মারাং বুরু, জাহের এরা, জাহিয়া বুরু, গোঁসায়—এই সমস্ত জনজাতি দেবতা যেমন পূজিত হন তেমনই চাষবাস, জন্মমৃত্যু, সমস্ত সামাজিক কাজকর্মেই বিভিন্ন দেবতা পূজিত হন। প্রতি গ্রামেই কোনও না কোনও দেবতার থান থাকে। সব পূজাকে ঘিরেই জনজাতিরা উৎসবে মেতে ওঠেন। ফসল বা শস্যকেন্দ্রিক উৎসবও অসংখ্য, আবার 'ঘোটুল'-এর মতো সামাজিক রীতি পালনের অনুষ্ঠানগুলোও উৎসব হয়ে ওঠে।

কালক্রমে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে জনজাতি সমাজের উৎসবের ওপর তার প্রভাব পড়েছে। যেমন এখন অনেক জনজাতি গোষ্ঠী দেওয়ালি, দশেরা, হোলি পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জনজাতি ও লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত। জনজাতি দেব-দেবীর মধ্যে সাঁওতাল, কোল, লোধা, শবর, মেচ প্রভৃতি জনজাতি জনগোষ্ঠীর করম, বড়াম, বোঙ্গা, হাগড়ামাড়াই, মারাংবুরু, জাহেরআয়ু, মড়েক ও তুরুংইক, সিনি, সরাইবোঙ্গা, হান্ডিবোঙ্গা, বাঘুত, বুড়াবুড়ি ও পূর্বপুরুষ পূজা প্রচলিত। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে কেউ কেউ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেব-দেবীর আঞ্চলিক রূপ (শিব, চণ্ডী, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা প্রমুখ)। আবার কেউ কেউ পুরাণের সঙ্গে কোনওরূপ সম্পর্কবিহীন লোকসমাজে পূজিত দেবতা (ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, কালুরায়, মাকালঠাকুর, ভাদু, টুসু প্রমুখ)। লৌকিক দেব-দেবীর পূজার পাশাপাশি মচ্ছলন্দপির, বাবন গাজি, ছাবালপির, খোকাপির, মানিকপির, দেওয়ানগাজি, সত্যপির, গোরাচাঁদ পির প্রভৃতির মতো কিংবদন্তী পির ও গাজি এবং বনবিবি— ফতেমাবিবি, ওলাবিবি প্রভৃতি দেবীরাও গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দ্বারা পূজা পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি ও লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে রাজ্যের লোকসংস্কৃতির যোগ অবিচ্ছেদ্য। এইসব দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে আয়োজিত লোক-উৎসব ও মেলাগুলো গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুষ্ট করার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে লোকনাট্য ও লোকসংগীত। সৃষ্টি হয়েছে লোকনৃত্য। মধ্যযুগে এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে রচিত মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যধারা।

পশ্চিমবঙ্গে পূজিত লৌকিক দেব-দেবীর একটি বড়ো অংশের পূজা হয় অব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা। কোথাও কোথাও মন্দির ও মূর্তি গড়ে পূজা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লৌকিক দেবতাদের পূজা হয় গাছতলায় বা কুঁড়েঘরে, শিলাখণ্ড, মাটির ঢিপি, পোড়ামাটির হাতিঘোড়া অথবা জীবন্ত গাছের। ধনসম্পত্তি লাভ, সন্তান লাভ, আরোগ্য লাভ, শস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি, বৃষ্টি, খরা নিবারণ, পুত্র-কন্যার বিবাহ, মামলামোকদ্দমায় জয়লাভ, শত্রুনাশ এমনকী হাঁস-মুরগির ডিম পাড়া, অথবা গাইয়ের

সিং বোঙ্গার পূজো

বাঁটে দুধ আসা, সব ধরনের কামনায় এই সব দেবদেবীর পূজা প্রচলিত।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জনজাতি গ্রামগুলোতে শস্যদেবতা করমের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়। ইনি 'করমরাজা' ও 'করম গোঁসাই' নামেও পরিচিত। ছোটোনাগপুরের বীরহোড়েরা একে 'করমভূত' নামেও অভিহিত করেন। পূজার দিন রাত্রি প্রথম প্রহরে গ্রামের সমাজপতি সমগ্র গ্রামের হয়ে করমপূজায় বসেন। করমগাছের দু'টি শাখায় লাল সুতো ও গামছা পরিয়ে বেদিতে পোঁতা হয়। পূজার কোনও মন্ত্র নেই; শুধু শস্যবৃদ্ধি ও অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য করমের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। পূজায় অন্নভোগ, 'তাহিরে' নামে এক প্রকার বিশেষ খিচুড়িভোগ ও পশুবলির প্রথা রয়েছে। বলির পর একটি ব্রতকথা শোনাতে হয়। তারপর শুরু হয় নাচগান। এই নাচের মধ্যে প্রধান হলো করমনাচ বা পাতানাচ। কোথাও কোথাও করমগাছের অভাবে শাল, নিম, গম্ভীরা বা সিজ গাছের ডালকে প্রতীক রূপে পূজা করা হয়। আবার বৃহত্তর মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় হিন্দুরাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে শাস্ত্রীয়-লৌকিক মিশ্র রীতিতে করমপূজার আয়োজন করে থাকে।

চণ্ডী মূলত একজন পৌরাণিক দেবী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরের লোকসমাজে বিচিত্র নামে ও প্রতীকে তাঁর পূজা প্রচলিত রয়েছে। যেমন, ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, রণচণ্ডী, গড়চণ্ডী, নেকড়াই চণ্ডী, হেঁটালচণ্ডী বা ইটালচণ্ডী ইত্যাদি। ভারতে দু' প্রকার দেবপূজা প্রচলিত শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। জনজাতি জনগোষ্ঠী কর্তৃক মাটির ঢিপি বা পাথরের টুকরোর মতো জড় পদার্থকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে গাছকেও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করার মধ্যে দিয়ে এই জনগোষ্ঠীর চণ্ডী ভাবনার মধ্যে সর্বপ্রাণময়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শস্যবৃদ্ধি, সুপ্রজনন অথবা গ্রামরক্ষার উদ্দেশ্যেও চণ্ডীপূজা প্রচলিত। লৌকিক চণ্ডীপূজার স্থান প্রধানত গাছতলা বা কুঁড়েঘরে। তবে পাকা মন্দিরেরও দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময় স্থানীয় চণ্ডীমন্দিরগুলোতে শিব, মনসা, শীতলা প্রমুখ দেবতাকে চণ্ডীর সঙ্গে পূজিত হতে দেখা যায়। লৌকিক চণ্ডীর কোনও মূর্তিরূপ নেই বললেই চলে। মাটির ঢিবি, পাথরের টুকরো বা বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও পৌরাণিক দেবীর মূর্তিতেই লৌকিক চণ্ডীর পূজা সম্পন্ন হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দেবীরা গ্রামদেবী। পক্ষান্তরে বাঙ্গালি গৃহবধূরা সাংসারিক কামনাবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী, কল্যাণচণ্ডী, রথাইচণ্ডী প্রমুখ দেবীকে তাঁদের মেয়েলি ব্রতের মাধ্যমে পূজার্চনা করেন।

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে, বর্ণ নেই; ধর্ম আছে, ধর্মগ্রন্থ নেই। ধর্মের আদি দেবতা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সিং বোঙ্গা হলেন সূর্যদেবতা। সূর্যের এমন প্রকাশ অনেক ধর্মেই দেখা যায়। চান্দো শব্দের অর্থও সূর্য। অন্যদিকে, মারাংবুরু আদিতে একটি পাহাড়ের নাম ছিল। ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় মহাজাগ্রত দেবতায়। বস্তুতপক্ষে সিং বোঙ্গা, চান্দো ও মারাংবুরুর সঙ্গে ঈশ্বরের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। শ্রেষ্ঠদেবতা অর্থে ঠাকুরজিউ ব্যবহৃত হয়। খুব সম্ভবত তা পরবর্তীকালে

সংযোজিত। অনুরূপ কথা ধর্মদেবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাঁওতাল বিশ্বাস মতে, আদি দেবতা নিরাকার। স্বর্গ-নরক কিংবা জন্মান্তরবাদের তেমন কোনো ধারণা তাদের মধ্যে নেই। ধর্ম-কর্ম আবর্তিত হয় পার্থিব জীবনের মঙ্গল অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে। বোঙ্গা মানে নৈসর্গিক আত্মা। তাদের মতে, আত্মা কখনো মরে না, সর্বদা পৃথিবীতেই বিচরণ করে। বোঙ্গারাই সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা। সাঁওতাল ধর্মীয় জীবনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বোঙ্গাদের অবস্থান। এমনকী প্রত্যেক বাড়ির জন্য গৃহদেবতা হিসেবে বোঙ্গা থাকেন। আদিতে মূর্তি পূজা না থাকলেও ইদানীং দুর্গা ও শ্যামাপূজার মতো দাঁসাই উৎসব এবং মাই বোঙ্গার পূজা চালু হয়েছে।

জনজাতিদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা প্রকৃতির উপাসক। হিন্দুরাও তাদের পুজোআচ্চা, রীতিনীতিতে এই লৌকিক সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। দুর্গাপুজোয় ঘটোত্তোলন, নবপত্রিকার পূজা, সন্ধিপূজা প্রকৃতির উপাসনার পরিচয় বহন করে চলেছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে রঙ্গিনী, সাতবহনী, চণ্ডী, কনকদুর্গা-সহ জনজাতি দেবীর পূজার পীঠস্থান রয়েছে। চণ্ডী এখানে নানা রূপে পূজিত হন যেমন জয়চণ্ডী, গুপ্তমণি, ভেটিয়াচণ্ডী, কালুয়াষাঁড়, বালিয়াবুড়ি। কুড়মি সমাজের পরব গণনার রীতি অনুসারে আশ্বিনের অষ্টমী তিথিতে ধানখেতে গুঁড়ি দিয়ে জাগানোর রীতি আছে। এবং এটা গর্ভবতী ধানগাছকে স্বাদ খাওয়ানো বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আরও একটি প্রবাদ পাওয়া যায় যে, ''জিতা ভাসে বোধন আসে।'' যা প্রান্তিক হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হলেও প্রতিফলন দেখা যায় কুড়মি জাতির হিতমিতান জনগোষ্ঠীর মধ্যে। 'জিতিয়া পরব'-এর পর 'বোধন' শুরু। অনেকের মতে দাঁশাই আসলে জলের আরাধনা। কুড়মি জাতির টুসু পরবের মূর্তি পূজার সূচনা হয়েছিল একসময়। যা এখনও সম্পূর্ণ রূপে মূর্তি পূজা হিসেবে পরিচিত হয়নি। পদ্মপুরাণ, মনসামঙ্গল প্রভৃতি রচনার পর মনসার কাল্পনিক মূর্তি পূজার সূচনা হয়েছে, আজ থেকে হয়তো দেড়শো বা দু'শো বছর আগে। যা আসলে ছিল 'বারি' (জল) পূজা। বাঙ্গালি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময় কেরওয়াল সংস্কৃতি অনুসরণ করে জনজাতি সমাজে ষষ্ঠী তিথিতে গোরুটিকা, অষ্টমী তিথিতে বিল জাগানো প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত আছে পিঠেপুলি খাওয়ার রীতিও; সেই সঙ্গে কাঠি নাচ, দাঁশাই নাচ ইত্যাদি।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, ওলাইচণ্ডী বা ওলাদেবী হলেন ওলাওঠা (কলেরা) রোগের দেবী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এই পূজা প্রচলিত। ওলাইচণ্ডীকে পুরাণে উল্লিখিত অসুর, দানব, রাক্ষস ও দৈত্যদের রাজা ও স্থপতি ময়াসুরের পত্নী মনে করা হয়। হিন্দুরা ওলাইচণ্ডীকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলিত মূর্তি মনে করে। তার গায়ের রং গাঢ় হলুদ। তিনি নীল শাড়ি ও গয়না পরে থাকেন। মূর্তিতে তার কোলে একটি শিশুকে দেখা যায়। জনজাতি ভক্ত শবরী ও শাসক নিষাদরাজ গুহক শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। অনেক নথি থেকেই স্পষ্ট, প্রায় ১৪ বছর জনজাতিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন রামচন্দ্র। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছেন তিনি। ঝাড়গ্রামের জনজাতিরা বছরে দু-বার দুর্গাপুজার আয়োজন করে থাকেন। একটি দুর্গাপূজার নাম কনক দুর্গাপূজা।

সাঁওতালরা দাঁশায় উৎসবেও প্রকৃতি রূপে দুর্গার আহ্বান ও পূজা করে। দুর্গাপুজোর অন্যতম বিষয় হলো দুর্গাকে প্রকৃতিরপে আরাধনা করা। উভয় উৎসবে দেবী দুর্গার আরাধনা ও পূজা করা হয়। সাঁওতালরা মূর্তি পূজা করে না, তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করেন। দুর্গাকে তাঁরা খরারোধী শুভশক্তি 'বাতাস' রূপে এবং দুর্গার দুই অনুচর লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বর্ষার পূর্বের ঘূর্ণিঝড় রূপে আহ্বান করে। ওই উৎসবের গানগুলিতে তার উল্লেখ রয়েছে।

''হায়রে হায়রে অকয় যাপে জুঁড়িয়াদা হায়রে হায় সিঞবির দল: কান দ হায়রে হায় মানবির দ হাসায় ডিগিরেন দেসে ছিতী দেসে কাঁপরা হায়রে হায় জারগে দা: দ নতে বিন হায়রে হায় তারসে রাকাব, তারসে নাড়গ হায়রে হায় সিঞবির দ ল: কা দ হায়রে হায় মানবির দ ল: কান দ হায়রে হায়''।

অর্থাৎ অনাবৃষ্টির ফলে মানভূমের (পুরুলিয়া) জঙ্গল এবং সিংভূমের জঙ্গলও যেন

জ্বলে পুড়ে গেছে। ছিতাকাপরা (ছিতা ও কাপরা জাহের দেবীদের অন্যতম দুই দেবী) আপনারা বৃষ্টি দিন।

ধুমধামের সঙ্গে পূজিত হন দেবী দশভুজা। জনজাতি মন্ত্রে দেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে মালদহের জনজাতি অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকের কেন্দুপুকুরের ভাঙাদিঘি গ্রাম। জনজাতিদের রীতি রেওয়াজে চারদিন ব্যাপী চলে দেবীর আরাধনা। পুজোর চারদিন উৎসবে মেতে ওঠেন জনজাতি সমাজের মানুষেরা। এই পূজোর প্রচলন করেছিলেন লব হাঁসতা। স্বপ্নাদেশ পেয়েই নাকি দেবী দুর্গার পূজো শুরু করেছিলেন লব হাঁসদা। স্থানীয় জনজাতি সমাজের পরিবারগুলি এই পূজো পরিচালনা করেন নিজস্ব ঢঙে।

হীরালিনী দুর্গোৎসব শুরু করেছিলেন শিল্পী ও গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের শিক্ষক বাঁধন দাস। সেটা ২০০১ সাল। বাঁধন দাসের এক দিদির নাম ছিল হীরা আর বাবা ছিলেন নলিনী দাস। এই দুই নাম জুড়েই 'হীরালিনী'। কিন্তু এমন একটি পারিবারিক নামকরণের ইতিহাস নিয়েই এই পুজো কেমন করে যেন স্থানীয় সাঁওতাল গ্রামবাসীদের নিজের উৎসবে পরিণত হল। তার কারণ বোধহয় পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কর্মকাণ্ড। এই পুজোমেলার রূপকাররা আসেন আশপাশের সাঁওতাল গ্রামগুলো থেকেই। ম্যারাপ বাঁধা, প্রতিমা গড়ায় হাত লাগানো থেকে শুরু করে পুজোর জোগাড়, নাচ-গান-যাত্রায় ওঁরাই প্রধান।

''ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশমাং শাবরোৎসর্বেঃ''

কালিকাপুরাণের ৬০তম অধ্যায়ের ৩৩ তম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, দশমীর দিন শবর উৎসবের সঙ্গে বিসর্জিতা হবেন দেবী। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, এই শবরোৎসবের মূলে আছে নববর্ষের উৎসব। তিনি লিখছেন, বিন্ধ্যপর্বতের ডান দিকে শবরজাতি বাস করত। নবরাত্র পার্বণ পালনের পর শবরদের রাজা ঘট বিসর্জনে বের হতেন। সারাদিন রাজ পুরোহিত রাজার হাতিশালায় হাতির, আস্তাবলের ঘোড়ার আর অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্রের পূজো করতেন। বিকেলবেলা ঘট বিসর্জনের শোভাযাত্রায় শামিল হতেন প্রজারা। নববর্ষের সূচনা সেই দিন থেকে। 'নববর্ষারম্ভে হর্ষক্রীড়া স্বাভাবিক'— তাই ঘট বিসর্জনের সময় প্রজারা জলকাদা নিয়ে খেলায় মেতে উঠতেন। কৃষ্ণযজুর্বেদ অনুসারে, সারা বছর ধরে যজ্ঞ করার পর এই দিনটাতে ঋত্বিকেরা হর্ষধ্বনি করতেন। শোভাযাত্রা করে সদলবলে রাজা খানিকটা দূরে মন্দির পর্যন্ত যেতেন। তারপর শমীপত্র নিয়ে ফিরে আসতেন। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন 'সেদিন যাত্রা করিলে সংবৎসর বিজয় হইবে', এই লোকবিশ্বাসের কারণেই পার্বণটিতে এমন সব আচার পালন।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকদেবতা হলেন ব্যাঘ্রদেবতা 'দক্ষিণরায়'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হিন্দু ও মুসলমান বাউল্যা, মউল্যা, মলঙ্গি প্রভৃতি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাছে দক্ষিণরায় হলেন বন্যপশু ও দানবদের নিয়ন্ত্রণকারী এবং সুন্দরবনের ভাটি অঞ্চলের অধিপতি। সুন্দরবনের অধিবাসীরা নদীতে মাছ ধরতে বা ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে কাঠ ও মধু আহরণে যাওয়ার আগে দক্ষিণরায়ের মন্দিরে পূজা দেন। কেউ কেউ বাঘের হাত থেকে বাঁচতে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে মাথার পিছনে দক্ষিণরায়ের মুখোশ পরে জঙ্গলে যান।

বেলিয়াবেড়ার বালিপাল গ্রামে আবার স্তূপীকৃত পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার 'ছলনে' দুর্গাপূজো করেন বাগদি দেহুরি। লোকশ্রুতি, এখানে দেবীর স্বপ্নাদেশে কেঁদগাছের জঙ্গলে পূজো শুরু হয়েছিল। তাই দেবীর নাম 'কেঁদুয়া'। একটি গর্তের মধ্যেই দেবীর অধিষ্ঠান। দুর্গাপুজোর সময় সেই গর্তে দেহুরি নিজের হাত চিরে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেন। জামবনির যুগিবাঁধে পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়ায় প্রতীকী ভাবে পূজিত হন 'দুর্গামণি'। এখানে পূজোর দায়িত্বে থাকেন শবর দেহুরি। হতদরিদ্র শবর সম্প্রদায়ের মতো দুর্গা এখানে দুয়োরানি। জনশ্রুতি, কয়েকশো বছর আগে জামবনি পরগনার এক সামন্ত রাজা চিল্কিগড় মৌজা থেকে শবরদের তাড়িয়ে দেন। শবরেরা যুগিবাঁধের কাছে গভীর জঙ্গলে ঘর বাঁধেন। তার পর সেখানে তাঁদের 'গরামদেবী' (গ্রামদেবী) দুর্গামণিকেই সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঝাড়গ্রামের গুপ্তমণি এলাকায় শবরদের আরাধ্যদেবী গুপ্তমণি দুর্গারূপে পূজিতা হন। খড়্গপুরে গ্রামীণ এলাকার সীমানা ঘেঁষা গুপ্তমণি এলাকার বুক চিরে চলে গিয়েছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক। রাস্তার ধারেই রয়েছে গুপ্তমণিদেবীর মন্দির। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে ৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত মন্দির।

৪৫০ বছরের পুরনো এই মন্দির। কেউ বলেন বনদেবী, কেউ বলেন বনদুর্গা, কেউ আবার গুপ্তমণি। নাম যাই হোক, কথিত আছে, এখানের রাস্তা বা মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মাকে স্মরণ করলে কার্যসিদ্ধি হবেই। শোনা যায়, আভিজাত্যহীন সাদামাটা এই মন্দির ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেব নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এই মন্দিরে প্রথম থেকেই মা পূজো নিয়ে আসছেন শবরদের হাতে। সেই প্রথা আজও চলছে। এই মায়ের মন্দিরের পূজো কোনও পুরোহিতের দ্বারা হয় না, পূজো হয় লোধা-শবর সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে। এখানে দুর্গাপূজো শুরুর আগে হয় পাঁঠাবলি, পূজোর সময়ে কোনও চণ্ডীপাঠ হয় না, লোধা শবররা নিজেদের মতো করে পূজো করেন। এখানে মা পাথরে বিরাজমান, মা প্রদীপ বা মোমবাতির আলোয় গুপ্ত অবস্থায় থাকেন। ভালো আলোর ব্যবস্থা করা হলে তা বেশিদিন টেকে না। এখানে মা আসলে একটি পাথরে বিরাজমান। মায়ের আলাদা করে মূর্তি গড়ে পূজো হয় না। কোনও পুরোহিত থাকেন না। চণ্ডীপাঠ হয় না। শবররা যেভাবে পারেন সে ভাবেই পূজো করেন দেবীর। এই মন্দির ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনি। মন্দিরের দেওয়ালে সে সব আঁকা। রামায়ণের কাহিনি, পার্বতীর কাহিনি, মহাদেবের কৈলাস। মন্দিরের বাইরে আঙ্গিনায় আলো থাকলেও মা যেখানে বিরাজমান সেখানে কোনও আলো নেই। মায়ের কাছে জ্বলে শুধু মোমবাতি অথবা প্রদীপের আলো। মা এখানে গুপ্তভাবে আছেন, তাই অন্ধকার। শোনা যায়, অনেকবার আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু টেকেনি বেশিদিন।

ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলের তলাই গ্রামে রয়েছে দেবী জয়চণ্ডীর থান। পূজোয় এখানে মেলা বসে। মোষ বলি হয়। একসময় ঘনজঙ্গল ছিল এই এলাকা। শবররা এখানে কাঠ কাটতে অথবা শিকার করতে আসত। একবার শিকারে আসা এক শবর যুবক হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে কীভাবে পড়লেন তা দেখতে গিয়ে ভালো করে জায়গাটা নজর করে তিনি দেখেন পাথরের এক দেবীমূর্তি পড়ে রয়েছে! সেটি নিয়ে যুবকটি বাড়ি ফিরে আসেন। আস্তে আস্তে মায়ের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। জাগ্রত দেবী বলে মানা হয় 'মা জয়চণ্ডী'কে। জয়চণ্ডী মন্দিরে সারা বছর মায়ের পূজা করেন শবররা। ■

চুড়কার বলিদানের সরকারি মর্যাদা দেওয়া হোক

অদ্বৈতচরণ দত্ত

দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের চকরামপ্রসাদ গ্রামের চুড়কা মুর্মু আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজ যখন আমরা আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সচেষ্ট হয়েছি অর্থাৎ দেশকে স্বাবলম্বী, স্বাভিমানী করে গড়ে তুলতে চাইছি, তখন চুড়কা মুর্মুকে আমাদের সামনে এক অনন্য নজির হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে।

দিনটা ছিল ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট। পাকিস্তানি খানসেনার গুলিতে চুড়কা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে জনজাতি সমাজের ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানহুর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একইসঙ্গে লেখা উচিত, দক্ষিণ দিনাজপুরের চকরামপ্রসাদ গ্রামের জনজাতি সমাজের চুড়কা মুর্মুর নামও। তিনি আমাদের কাছে বিশেষ গর্বের। দেশের জন্য তাঁর বলিদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে, ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছিল। সেই উত্তাল সময়ে পাকিস্তানি খানসেনারা বর্তমান বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম চকরামপ্রসাদ আচমকাই আক্রমণ করে বসে। চুড়কা বুঝতে পারে যে পাকিস্তানি খানসেনারা তাদের গ্রামে আক্রমণ হেনেছে। গ্রামবাসীদের সজাগ করতে হবে। বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে গোলার বাক্স নিয়ে নিজেই সে খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সহযোগী হলো। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর গ্রামের মাস্টারমশাই হরেন চাকলাদার বলেছেন, 'খান সেনাদের আক্রমণে সব গ্রামবাসী যখন ভয়ে পালাচ্ছেন, সেই দেখে আমিও পালাচ্ছিলাম। তখন চুড়কা আমায় ডেকে বলল, মাস্টারমশাই আপনিও পালাবেন? তার কথায় আমার সংবিৎ ফিরল। আমার ছাত্রের সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তার জন্য গর্ব অনুভব করলাম। গ্রামবাসীদের সজাগ করলাম, তারা যাতে না পালিয়ে রুখে দাঁড়ায় তার জন্য সচেষ্ট হলাম।' এই শিক্ষকের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, কী অসমসাহসী বীরত্ব সেদিন প্রদর্শন করেছিলেন চুড়কা। মাতৃভূমি রক্ষায় তাঁর

ভূমিকা নিঃসন্দেহে চিরকাল উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে।

সেভাবে গ্রামবাসীদের সদর্থক সাড়া না পেয়ে চুড়কা মুর্মু একাই বিএসএফের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চললেন পাকিস্তানি খাসসেনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। একদিকে খানসেনা, অন্যদিকে মাত্র তিনজন বিএসএফ জওয়ান ও চুড়কা। পাটক্ষেত, ধানক্ষেতের মধ্যে লড়াই চলছে। ভারতীয় সেনা বন্দি হলো। চুড়কা দেখল, তার জীবন বিপন্ন। কিন্তু গ্রামের মানুষের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, শত্রুপক্ষ যাতে তাদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে, সেইজন্য তিনি তার কাছে থাকা গুলিভর্তি বাক্স ও অস্ত্র-সরঞ্জাম পুকুরে ফেলতে আরম্ভ করলেন, যাতে তা কোনোভাবেই শত্রুসেনার হাত না পড়ে। পুকুরে ফেলার আওয়াজ খান সেনাদের কানে যেতেই মুহুর্মুহু চুড়কার ওপর তারা গুলিবর্ষণ করলো। তিনি লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে 'বন্দেমাতরম্', 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি নির্গত হলো। তিনি বীরগতি প্রাপ্ত হলেন।

আজ স্বীকার করতেই হবে যে, চুড়কা মুর্মু আমাদের গর্ব। তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালের ২ জুলাই গ্রামের এক দরিদ্র জনজাতি পরিবারে। পারিবারিক দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি দেশের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। 'জন্ম হোক যথা-তথা, কর্ম হোক ভালো'--- এই প্রবাদবাক্যের সার্থক প্রয়োগ দেখলাম আমরা। তিনি আবাল্য স্বয়ংসেবক। প্রয়াণ সময়ে তিনি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত।

আজ আত্মনির্ভর ভারতের সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেই চুড়কা নিজের গ্রামকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গ্রামের উন্নতি কীভাবে করা যায়, এই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। কৃষিকাজ, গোপালন ছাড়াও গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা চুড়কা স্বহস্তে করেছিলেন। তার গ্রামে পানীয় জলের কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজের হাতে কুয়ো তৈরি করেছিলেন। পানীয় জলের ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রামের যুবক-কিশোরদের জন্য শরীরচর্চা ও পাঠদানের ব্যবস্থাতেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

তাঁর বলিদান দিবস ১৮ আগস্টকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর স্বয়ংসেবকরা তার গ্রামে পৌঁছায়। তারা তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, কাবাডি খেলা আয়োজন করা ছাড়াও তাঁর স্মরণে নির্মিত বেদিতে মাল্যদান করে। অংশ নেন স্থানীয় মানুষজন, ছাত্র-যুবরা। এই কার্যক্রম এখন পরম্পরা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিগত বহু বছর ধরে যে স্কুলে তিনি পড়তেন, সেখানে তাঁর নামে ছাত্রবৃত্তি চালু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বই-খাতা-কলম দেওয়া হয় চুড়কা মুর্মুর বলিদান দিবসে। সেখানকার ছাত্রাবাসও তাঁর নামে রাখা হয়েছে। তবে একথা সত্যি, এই ধরনের বলিদানের পরম্পরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে বহু আগে থেকেই রয়েছে। একথা আজ স্পষ্ট, চুড়কার সাহসিকতার উৎস সঙ্ঘের শাখা। তাঁর বন্ধু পুলিন বর্মন বলেছেন, চুড়কার দুর্জয় লড়াই গ্রামবাসীদের প্রেরণার পাথেয় হয়ে আছে। স্থানীয় মানুষজন এভাবেই তাঁকে মনে রেখেছে।

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে হয় যে দেশের জন্য চুড়কা মুর্মুর বলিদান সত্ত্বেও তাঁর বীরগতিপ্রাপ্তির মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলেছে। অনেক মানুষ, এমনকী ইতিহাসবিদেরাও তাঁকে তাঁর হৃতসম্মান ও স্বীকৃতি এতদিনে দিচ্ছেন। তবু কেন তিনি এব্যাপারে আজও সরকারি স্তরে স্বীকৃতি লাভ করলেন না তা একটা রহস্য। তিনি একজন স্বয়ংসেবক বলেই হয়তো এই উপেক্ষা। অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সঙ্ঘচালক তথা চুড়কার বন্ধু অরুণ মহন্ত বলেছেন, 'তাঁর বলিদানের স্বীকৃতি ইতিহাসের পাতায় থাকলেও সরকারের খাতায় নেই'। আমরা অবিলম্বে এর অন্তর্ভুক্তি দাবি করছি। চুড়কার বলিদান ব্যর্থ হয়নি। তিনি আমাদের সামনে আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবেন, ছাত্রযুব সমাজের আদর্শ ও প্রেরণা হয়ে থাকবেন। তাঁকে আগামী প্রজন্ম আরও ভালোভাবে স্মরণ করবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ)

স্বধর্ম ও স্বদেশ রক্ষায় জিতু সাঁওতালের অবদান

তরুণ কুমার পণ্ডিত

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং হিন্দু সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে, এই সংগ্রামের অগ্নিশিখা আরও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বীর জাতির নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। এর মধ্যে যেমন এই লড়াইয়ের নায়ক ছিলেন বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানু, তেমনি উত্তরবঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিতু সাঁওতাল। জিতু সাঁওতাল ছিলেন সাঁওতাল স্বাভিমানের অন্যতম নেতা।

মালদা জেলার হবিবপুরের মঙ্গলপুরা গ্রামে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই দেবদ্বিজে ভক্তি দেখে বাবা বীরেন হেমব্রম ও মা খুব খুশি ছিলেন। জিতু চেহারায় ছিলেন বেশ হোমরা চোমরা এবং লড়াকু স্বভাবের। সত্যম শিবম বলে একটি ধর্মীয় সংস্থায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ইংরেজ আমলে মালদার বেশিরভাগ জমিদার ছিল মুসলমান। সেই জমিদাররা কথায় কথায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতো। নীলকর সাহেবরা এইসব জমিদারের সাহায্য নিয়ে হিন্দু চাষিদের ওপর দমনপীড়ন চালিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। জিতু তাদের মধ্যে সাহসী ও প্রতিবাদী হয়ে দুষ্ট জমিদার রাজ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। চাষিদের সংগঠিত করে ফসলের একটা অংশ কর হিসেবে দিতে অস্বীকার করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে জিতুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

এদিকে জিতু সাঁওতাল মালদা শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে আদিনা মসজিদে (আদিনাথ মন্দির) ঢুকে লৌকিক মতে শিবপূজা শুরু করেন। তার দাবি ছিল, আদিনা মসজিদ যে জমিতে তৈরি করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে শিবক্ষেত্র। একসময় এখানে আদিনাথ (শিবের) মন্দির ছিল। সেটি ধ্বংস করে তার উপর আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে প্রায় ৬০০ সাঁওতাল যোদ্ধা আদিনা মসজিদ নিজেদের দখলে নেয়। দখল মুক্ত করতে আসে পুলিশ, শুরু হয় যুদ্ধ। একদিকে তির ধনুক, কুঠার, বল্লম, অন্যদিকে গুলি বন্দুক। এই যুদ্ধে পাঁচজন সাঁওতাল যোদ্ধা মারা যান। জিতু ও অন্যান্যদের কুঠারের আঘাতে দুজন পুলিশ মারা যায়। তৎকালীন জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও বিরাট পুলিশ বাহিনী জিতুকে বোঝানোর চেষ্টা করে ঘুষ দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু আদিনা মসজিদ পুলিশ ঘিরে ফেললেও স্বধর্ম রক্ষায় তিনি নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দু সরে আসেননি। শোনা যায়, ইংরেজদের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পাওয়ার লোভে গনিখান চৌধুরীর বাবা জিতু সাঁওতালকে পিঠে গুলি করে হত্যা করেন।

একদিকে সাঁওতালদের যখন ইংরেজ সাহেবরা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করতো সেই সময়ে জিতুর এই আত্মত্যাগ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারায় জনজাতি সমাজকে ধরে রাখতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

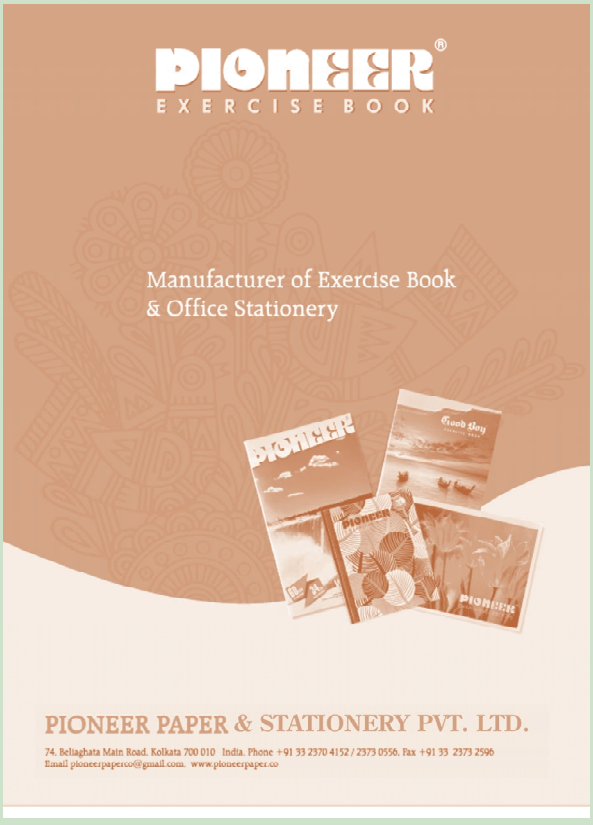

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

লোকশিল্পীরা ইতিহাসে অমর করে রেখেছেন সাধারণ মানুষকে

কালিকানন্দ মণ্ডল

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের।'

লিখেছেন প্রখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। দ্বিধাহীন ভাবে কবি-সাহিত্যিকরা যতই জনজাতির সঙ্গে একাত্মবোধ করুন না কেন আধুনিক সমাজের ব্যক্তিদের কাছে জনজাতিসমাজ ব্রাত্যই রয়ে গেছে। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় যেসব শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয় সেগুলি সাধারণত নিম্নবর্ণের শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত। সে কারণে শিল্পকর্মের মধ্যে এই নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনই চিত্রিত হয়। কিন্তু এই জনজাতি মানুষদের সমাজে ব্রাত্য করে রাখা হয় বা মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। আর সেজন্যই লোকশিল্প উচ্চবর্ণের প্রভাব মুক্ত ছিল। লোকসংস্কৃতির স্রষ্টারা জনজাতি হওয়ায় তাদের শিল্পকর্ম ও শিল্পীসত্তা সমাজে মর্যাদা পায়নি। পাশাপাশি জাত, ধর্ম, বর্ণে বিভক্ত সমাজে চিরকাল তারা ব্রাত্য হয়েই থেকে গেছেন। পালরাজাদের সময় থেকে বাঙ্গলার লোকশিল্প স্বমহিমায় বিকশিত হতে শুরু করে। এই বিকাশকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যে। এই সময়েই সহজিয়া, মরমিয়া প্রভৃতি মতবাদের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। 'জনতার মধ্যে এই মত প্রচারের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ছিল লোকসংস্কৃতি। মানুষ প্রকৃতি ও সংসারকে শাস্ত্রের কতকগুলো মনগড়া ধারণার মধ্যে দিয়ে না দেখে প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করাটাই এর প্রধান কথা। সেখান থেকেই এসেছে বাংলার লোকশিল্পের বলিষ্ঠ মাধুর্য, সহজ ভাবুকতা, উজ্জ্বল প্রাণ-পরিপূর্ণতা।' (রবীন্দ্র মজুমদার)।

বাঙ্গলার লোকশিল্পের সংগ্রহশালায় শিল্পকর্মের নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যাবে এই জনজাতির এক বলিষ্ঠ ইতিহাস। প্রাচীনকালে বাঙ্গলার অধিবাসীরা ভারত ভূখণ্ডের অন্য প্রদেশের মানুষের কাছে ব্রাত্য ছিল। নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, 'মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে সুহ্মদের 'পাপ' কোম বলা হইয়াছে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হইয়াছে মধ্যদেশ বা আর্যাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে গেলে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।' পরবর্তীকালে পাল আমলে নিম্নশ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রের বিবেচ্য থাকলেন। সেন আমলে তারাই ব্রাত্য হলেন এবং উচ্চবর্ণের সামগ্রিক উন্নয়নের সহযোগী হলেন। উচ্চবর্ণের এলিট দ্বারা প্রণিত ইতিহাসে নিম্নবর্ণের কোনো স্থান হলো না। 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এতদিন এলিটদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন তো শুধু এলিট বা উচ্চবর্গ করেনি, সাব অলটার্ন তথা নিম্নবর্গও নিজেদের তাগিদে নিজেদের মতো করে আন্দোলন করেছে'

(অনুরাধা রায়)। বর্তমানে নিম্নবর্ণের লোকশিল্প ইতিহাসে উপযুক্ত জায়গা করে নিয়েছে।

বাঙ্গলার তাঁতের খ্যাতি সর্বত্র। তাঁতে বোনা শাড়ির নকশা সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু তাঁতিদের কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই। সামাজিক ভাবে তারা নিম্নবর্গীয় জনজাতি। তাদের বাস করতে হয় গ্রামের এক প্রান্তে। একটি প্রচলিত গানে তাদের কথা এমন বলা হয়েছে :

'কুলহি মুড়ায় তাঁতিঘর
কাপড় বুনে ছর ছর'

অর্থাৎ গ্রামের প্রান্তে তাঁতীর বাস, তিনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। লোককবিরা কাব্যে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি কাপড় বোনেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

'তাঁতি বসে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।'

বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতের বদলে শুরু হয়েছে পাওয়ার লুমের ব্যবহার। তা সত্ত্বেও হাতে বোনা তাঁতের ঐতিহ্য ও চাহিদা তুঙ্গে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার ঘোড়ানাশ গ্রামের জামদানি শাড়ির খুব কদর। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন সেখানকার তাঁতশিল্পীরা। 'ঘোড়ানাশের বাসিন্দা, দুই ভাই যাদবেন্দ্র দাস ও রাঘবেন্দ্র দাস গ্রামের এই শিল্পকেই বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিত্য নতুন শাড়ি তৈরি করে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করছেন তাঁরা' (অভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই সময়, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

বালুচরি শাড়ির জন্য বিখ্যাত ছিল মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বালুচর নামক স্থানটি। যদিও শিল্পীরা বালুচরে বসবাস করেন না। তারা থাকেন রামডহর, বেলিয়াপুকুর, বাহাদুরপুর, রণসাচ্চার, রমনাপাড়া, আমাই পাড়া, বাগডহর প্রভৃতি গ্রামে। এই নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর মানুষ তাঁত শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেও তাঁদের কথা কেউ মনে রাখেনি। শুধুমাত্র বাহাদুরপুরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দুবরাজ দাস নামে এক শিল্পীর জন্য। জাতিতে তিনি চর্মকার হলেও তাঁর অসাধারণ শিল্পের জন্য তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। মীরপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি বাহাদুরপুরের থেকে দুবরাজপুরে এসে দুবরাজ শাড়ি, ফুলকাটা শাল, মেঝের চাদর, গলাবন্ধ নির্মাণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষজনকে এই শিল্পে বিশেষ ভাবে দক্ষ করে তুলেছিলেন। অধুনা দুবরাজ দাসের মীরপুরস্থ বসতবাটী গঙ্গাবক্ষে বিলুপ্ত হয়েছে। তাঁতশিল্পী দুবরাজ চামারের কোনো স্মৃতিচিহ্ন আজ আর নেই।

নিম্নবর্ণের জনজাতিকৃত শিল্পকর্মকে ইতিহাসের পাতায় বা শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা যে উচ্চবর্ণের মধ্যে একেবারে ছিল না এমন নয়। এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ হলো দেশজ গ্রন্থাগার ও স্থায়ী সংগ্রহশালা। কিন্তু গ্রন্থাগারের পরিবর্তে সংগ্রশালা বা মিউজিয়ামে তাদের শিল্পকীর্তি স্থায়ীরূপ পায়। সমাজের অন্তেবাসী মানুষের কথা জানার সুযোগ আমাদের কম, তবে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে তাঁদের দেখার অবকাশ মেলে। তাদের সৃষ্টি আমাদের কাছে গৌরবের হলেও, স্রষ্টাকে মর্যাদা দেওয়ার মতো উদারতা আমরা দেখাতে পারিনি। অধিকন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে জাতিভেদ প্রথা এক জ্বলন্ত সমস্যা। এদের

মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ এখনো দূর করা সম্ভব হয়নি। 'বেড়াজনার্দনপুর মন্দিরের শিল্পীর লিপিফলকে শিল্পীর পদবির বদলে উপজীবিকার উল্লেখ করা হয়েছে 'ছুতোর' কথায়। ...বাংলাদেশের এইসব সূত্রধর স্থপতিরা মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে যে অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করে গেছেন তা আমাদের একান্তই গৌরবের বিষয়। দুঃখের বিষয়, অতীতে আমাদের সমাজ এইসব শিল্পীগোষ্ঠীকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি। তদানীন্তন সমাজ সূত্রধর কথাটিকেও অবজ্ঞাভরে যে 'ছুতোর' নামে অভিহিত করেছেন তারও লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। সেকালে সমাজে উচ্চমূল্য না পাওয়ার জন্যে সূত্রধর সমাজ তাদের পদবিতেও হয়ে পড়েছেন 'পতিত' (তারাপদ সাঁতরা)। 'হাওড়া জেলার কল্যাণপুর গ্রামের দামোদর জীউর নবরত্ন মন্দিরের (১৭৮৬) টেরাকোটা ফলকে কোদাল চালনাকারী এক শ্রমজীবীকে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতিবৃত্তিতে যুক্ত সম্প্রদায়ের কথাও এখানে ফলকে চিত্রিত হয়েছে। এখানে উৎকীর্ণ হয়েছে এক তাঁতি চরকা কাটুনির দৃশ্যফলক। বীরভূম জেলার উচ্চকরণের শিবমন্দির (১৭৬৮) এবং হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের আটচালা শিবমন্দিরেও (১৭৬২) এইরকম চরকা দিয়ে সুতোকাটার দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে' (দীপককুমার পণ্ডা)। বাঙ্গলার পটচিত্রে নৌকার মাঝি, জাহাজের মাল্লা (কমলেকামিনীপটে), ব্যাধ (চণ্ডীমঙ্গল পট), পালকিবাহক প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের জীবন অনেকভাবেই এসেছে। এই লোকচিত্রকলায় নিম্নবর্ণের মানুষ সহজেই অনেকটা জায়গা করে নিয়েছেন। এই লোকশিল্পীদের

সৃষ্ট চরিত্রগুলি এসেছে সমাজজীবন থেকেই। শিল্পীকে এখানে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না; এমনিভাবে পটচিত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জন্ম নেয় শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র।

হুগলি জেলার বাবনানের পরিচিতি বেড়েছে চিকন কাঁথাস্টিচ হস্তশিল্পের নামে। ভারতবর্ষে বাবনান চিকনের খুব খ্যাতি। বাবনান চিকন এক ধরনের কাঁথাস্টিচ। এটা জরির শিল্পকাজের মতোই দেখতে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এর বড়োসড়ো বিক্রির বাজার। এইসব কৃতিত্বের পেছনে আছে এখানকার সাধারণ দরিদ্র মুসলমান মহিলারা। তাঁরা বাড়িতে বসে চিকনের কাজ করেন। যারা বাবনান জায়গাটিকে সবার কাছে পরিচিত করিয়েছেন তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে, তাঁরা থাকেন অন্তরালে, বাড়ির বাইরে বেরোনোর সুযোগ নেই। ন্যূনতম অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত ও অবহেলিত।

অন্যদিকে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় কাঠের একটি শিল্প ফলকে দেখা যাচ্ছে এক নাপিত বাড়ির পুরুষের চুল কাটছেন আর সম্ভবত তাঁর স্ত্রী সেই বাড়ির মহিলাদের পায়ে আলতা পরাচ্ছেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানে পাত্রীর গায়ে হলুদের পর আলতা পরানো হয় 'আলতা পরানো মাসি'দের দ্বারা। এ সমস্ত শিল্পকর্ম থেকে আমরা সামাজিক চিত্র পেয়ে থাকি। এক একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ হয়, সাধারণ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমার চারিদিকে এমন একটি গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই ভাঙতে পারিনে— অথচ মানুষের সংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, থেকে থেকেই সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে— মানুষের সঙ্গে যে জীবনোত্তাপ তাও প্রাণ ধারণের পক্ষে আবশ্যক' (ছিন্নপত্র)।

লোকজীবন তথা গ্রামীণ জীবনকে লোকশিল্পীরা বা হস্তশিল্পীরা যে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার নমুনা আমরা সংগ্রহশালায় সযত্নে সংগৃহীত নমুনা থেকে জানতে পারি। তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খশিল্প বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁরা বাস করেন পশ্চিমবঙ্গের দীঘা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ব্যারাকপুর, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু শঙ্খশিল্পী এখানে এসে এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের শিল্পনৈপুণ্যে শিল্পকর্মের মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সংকট সময়ের চিত্র, মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্টকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন নিয়ে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য তারাই আবার পুতুলের মাধ্যমে নানা চরিত্র চিত্রায়িত করেছে যেগুলি সংগ্রহশালার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। যেমন হাল কাঁধে চাষি,

মাথায় মাছের ঝুড়ি-সহ জেলেনি, রিকশাচালক, গম পেষানি মহিলা, দুধের পাত্র-সহ গোয়ালিনি মা, চুপড়ি নিয়ে বসা দোকানি-সহ বহু চরিত্র। 'এই শ্রেণীর পুতুল থেকে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিচয় লাভ করা যায়। সেই তথ্য থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ভারতীয়রা কর্মরত মানুষকে কোনোক্রমেই হেয় করে দেখেননি। মেলায় মেলায় বা বাজারে ঘুরে-ফিরে শিশুদের হাতে এই শ্রেণীর পুতুল তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রত্যয়টি সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি' (সন্তোষ কুমার বসু)।

শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের জনজাতির জীবন বৈচিত্র্য লোকশিল্প বা লোকসংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যুগ যুগ ধরে এই জনজাতির জীবনের হদিস পাই অতীতের প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে সংগ্রহশালাতে সযত্নে রক্ষিত প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির মধ্যে। যা থেকে শ্রমজীবী তথা নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে অনুভব করতে পারি। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত একটি পোড়া মাটির ফলকে হাতি ধরার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যেখানে পিছনেও তিনটি হাতি দাঁড়িয়ে। মাঝের বন্য হাতিটিকে দুটি পোষা হাতি ঠেসে ধরেছে। কাছে দাঁড়ানো মাহুত বন্য হাতিটিকে বাঁধার চেষ্টা করছেন। চন্দ্রকেতুগড়ের অন্য একটি ফলকে এক ভারবহণকারী নারীমূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। সেটিও খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাওয়া। তাম্রলিপ্ত থেকে পাওয়া ফলকে দেখা যাচ্ছে বৃত্তাকার পর্ণ কুটিরের পাশে দুজন কর্মরত ব্যক্তি। তাম্রলিপ্তের অপর একটি ফলকে প্রায় অর্ধনগ্ন মেষপালককে দেখা যাচ্ছে যে দড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে রেখেছে। উত্তর ভারতের একটি প্রত্নফলকে একটি মেলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সেই মেলায় সারি দিয়ে কলস রাখা আছে। এছাড়া মোরগের লড়াই, মল্লক্রীড়া, মুষ্টিযুদ্ধ চলছে। রায়বেরিলি জেলার প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া গেছে এক নারীমূর্তি। তার নীচে এক ছত্রবাহিকা নারী দীর্ঘ পরিশ্রমের হতাশায় ভগ্ন, তাঁর চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত। পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত ফলকটি অষ্টম-নবম শতাব্দীর বলে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে শিকারে প্রাপ্ত পশুবহনকারী, পাতাচ্ছাদিত কটিবাস পরিহিত এক ব্যক্তিকে। বানগড় থেকে প্রাপ্ত ফলকে স্বল্পবাস পরিহিত এক জেলে মাছ ধরছে। গরুড়বাহনরত বিষ্ণুমূর্তি বা গরুড়মূর্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেখানে ভাস্কর্যে নৌকা কিংবা জাহাজে মাঝি মল্লাকে পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির মন্দির ফলকে পালকি বাহকরা পালকি বয়ে নিয়ে চলেছেন। এ সমস্ত প্রত্ননিদর্শনের মাধ্যমে লোকশিল্পীরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনযাত্রা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান পটুয়ারা ইসলাম আচার পালন করলেও ছবি আঁকেন পৌরাণিক দেব-দেবীর এবং মূর্তি গড়েন কালী, সরস্বতী প্রভৃতির। পূর্বমেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার খণ্ডগোলা পঞ্চায়েতের কেশববাড় গ্রামের ৫১টি চিত্রকর পরিবারের মধ্যে ৮টি পরিবার সারাবছর ঠাকুর গড়েন। নবীন প্রজন্মও একাজে উৎসাহী। 'এই গ্রামের সম্প্রীতির ঐতিহ্য গর্ব করার মতোই। প্রতি বছর চৈত্রমাসে চিত্রকর পাড়ার উদ্যোগে ওলাবিবির উৎসব হয়। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে ভিড় জমান বহু হিন্দুভক্তও' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪.১১.২১)। কোথাও কোথাও এরা নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনাচারকে অনুসরণ করেন। পট-শিল্পীদের প্রত্যেকের দুটি নাম— একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমান। সম্প্রীতির এমন নিদর্শন বিরল। তবে সবচেয়ে আশার কথা হলো— 'গত দু-এক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা বিশেষত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এখন সরেজমিনে জানতে চাইছেন বাঙ্গলার লোকায়ত জীবন পরিবেশকে। সেখান থেকে পটশিল্পী, বাউল ফকিরদের শিক্ষা প্রাঙ্গণে আমন্ত্রণ করে এনে শুনতে চাইছেন তাদের সমস্যা, বুঝতে চাইছেন, তাঁদের সংকটের স্বরূপ' (সুধীর চক্রবর্তী)।

একথা অনস্বীকার্য যে ইতিহাস শুধু রাজারাজড়ার নয়, ইতিহাস সব মানুষের। সেই ইতিহাসকে জানা বা চর্চা করা নিম্নবর্ণের জনজীবনে নিয়ে আসবে আলোকবর্তিকা। আর সে কারণে বোধহয় ৫০০ বছর আগে চৈতন্যদেব ঘোষণা করে গেছেন—

'নীচ হয়ে করিব আমি নীচের উদ্ধার।
অতি নিম্নে না নামিলে কীসের অবতার।।
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল উচ্চেতে না রবে।
নিম্ন খাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে।।' ■

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে শঙ্খধ্বনি করুন

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ১২ই জানুয়ারি সকাল ৬টা ৪৯ মিনিটে প্রত্যেক বাড়িতে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সুন্দর বাতাবরণের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের রীতি চালু করি।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুগতদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি মানুষ তাঁর জন্মদিন পালন করতে পারি না বিভিন্ন কারণে। আমরা মাঙ্গলিক ধ্বনি হিসাবে প্রচলিত শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে (১২ই জানুয়ারি, সকাল ৬টা ৪৯ মিনিট) জন্মদিন পালনের রীতি চালু করি, তাতে একশ ভাগ মানুষ তাঁর জন্মদিন পালন করতে সক্ষম হবেন। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করবেন সেই মুহূর্তে তাঁদের হৃদয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সত্ত্বার অনুরণন ঘটবে এবং তাঁদের হৃদয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের দান করা শিক্ষা ত্বরান্বিত হবে। তাঁরা সমৃদ্ধ হবেন। ক্রমান্বয়ে সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে।

এতে বাংলা তথা ভারত তথা হিন্দুত্বের এক সঙ্গে ধ্বনির মাধ্যমে সংগঠিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখল করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর পক্ষে

গৌতম প্রধান,

কাঁথি ৩ ব্লক, মো ঃ ৯৯৩২৬৩৪২৮২

সিধু কানু

রাষ্ট্র রক্ষায় জনজাতি সমাজের অবদান

উত্তম মাহাতো

প্রায় ১৪০ কোটির দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এর মধ্যে ১১ কোটির বেশি জনজাতি সমাজের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গে ৫.৫ শতাংশ জনজাতির বসবাস (২০০১ জনগণনা অনুযায়ী)। আমাদের দেশের ভূপ্রকৃতি— কোথাও পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, নদী নালা, মরুভূমি ও গ্রাম শহর দিয়ে। জনজাতি সমাজের বন্ধুরা প্রকৃতি পূজারি হওয়ার কারণে পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গলেই বসবাস তাদের। পাহাড়, পর্বত, গাছ, পাথর তাদের পূজাস্থান। জনজাতি সমাজের মধ্যে মারাং বুরুর যে পূজা হয়ে থাকে আসলে তা শিবঠাকুর। দুর্গাপূজার সময় তাদের আগমনী নাচগানে এখনো বহুল প্রচলিত দাশাই নাচ। আর কালীপূজাতে সহরাই নাচগানের তো কথাই নেই। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোক মনে করেন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কন্দরে যে সব জনজাতি বন্ধুরা বসবাস করেন তারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজ। হ্যাঁ, অবশ্যই সেদিকে তারা পিছিয়ে কিন্তু হিন্দু সমাজের রীতিনীতি আচার আচরণে কোনও খামতি নেই। ভারতবর্ষের পরিচয় হলো— 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। আজও সাঁওতাল বাড়িতে গেলে প্রথমে পিতলের ঘটিতে ও থালাতে পা ধোয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রতিদিন

গোবর দিয়ে ঘর নিকানো, এখনো একসঙ্গে বসবাস করা, জল জঙ্গল সুরক্ষার শপথ তাদের আচার আচরণে। পরিবেশ রক্ষা তাঁদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। আরণ্যক জীবনকে তারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এছাড়াও ভারতবর্ষের সুরক্ষা তথা দেশভক্তির পরীক্ষায় আজও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁরা বিদেশি শত্রুদের চিহ্নিত করার কাজ করে যাচ্ছেন। মহাভারতের ঘটোৎকচ ধর্মের পক্ষ নিয়ে অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রামায়ণের শবরীমাতার ভক্তির কথা আমরা জানি। হনুমান জাম্ববানদের সঙ্গে ভগবান রামচন্দ্রের সম্পর্ক, ধর্ম সমাজ নারীজাতির সুরক্ষা ও মান সম্মান রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশ হাজার বছর পরাধীন থাকার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মুঘল ও খ্রিস্টানরা জনজাতি সমাজের গৌরবময় ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তাদের নাকি কোনো ইতিহাস নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জনজাতি সমাজ বহুকাল ধরে নীরবে সমাজের সেবা করে চলেছে। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করার জন্য ১৮৫৮ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু। জমি ও জঙ্গল রক্ষার লড়াই ইতিহাসে 'সরদারি লড়াই' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরদারি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গণসংগঠন তৈরির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদ, পুরাণ চর্চা। এখানেই বীরসা মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে সংগঠন তৈরির কাজ হাতে নেন গুরুদেবের নির্দেশে। বীরসা মুণ্ডার আন্দোলনে বাঙ্গলার জনজাতি সমাজে ও ছোটোনাগপুরের এলাকাতে বিশেষ করে বীরভূমে প্রভাব অবিসংবাদিত।

১৮৫৫ সালে শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ জুন ৩০ হাজারেরও বেশি সাঁওতাল যোদ্ধাকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে প্রথম জনযাত্রা করেন বীর সিধু-কানু। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য

ফুলো মুর্মু ও ঝানো মুর্মু

মিছিলের সূচনা, ইংরেজ রাজশক্তিকে দেশ থেকে তাড়ানোর অঙ্গীকার— যেটা হুল দিবস নামে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু, কানু, চাঁদ ভাইরৌ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নারীদেরও ভূমিকা কম ছিল না— ফুলো মুর্মু, ঝানো মুর্মুদের সাঁওতাল বিদ্রোহে আন্দোলনে এঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফলে ব্রিটিশ সিপাইরা ঝানো মুর্মুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করে তাঁর দেহ রেল লাইনে ফেলে রেখে যায়। ইতিহাসে প্রথম বীরাঙ্গনা হিসেবে সাঁওতাল সমাজ তাঁকে আজও শ্রদ্ধা করে।

১৭৮১ সালে বিহারের ছোটো গ্রামের ছেলে তিলক মাঝি সাঁওতাল পরগনা বা ভাগলপুর পর্যন্ত নয়, সম্পূর্ণ দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নেন মাত্র ৩১ বছর বয়সে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক সময় কারাবাস করেছিলেন উত্তরপূর্ব ভারতের ১৭ বছরের নাগাল্যান্ডের রানিমা গাইদিনল্যু। এই ছোটো সাহসী বালিকা নিজের দেশভক্তির আবেগে ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

১৮৩২ সালে ১ মে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মানভূম ও বরাভূমের ভূমিজ জনজাতিদের নিয়ে গঙ্গানারায়ণ সিংহ বরাবাজার কাছারিতে আক্রমণ করেন। ১৪ মে তিন হাজার যোদ্ধাকে নিয়ে রাসেল সাহেবকে ঘিরে ফেলে। রাসেল সাহেব প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়, বরাভূমের পূর্বদিকে আকরো, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর ফুলকুসমা ইত্যাদি স্থানে হামলা চালানোর ফলে সমস্ত এলাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

যে সময় জনজাতি সমাজ নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, সেই সময় মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার কামারবান্দি গ্রামে জন্ম নেন সাধু রামচাঁদ, তিনি সাঁওতালি সাহিত্য বিকাশে গান রচনা করেন। শাশ্বত ধর্ম নামে গ্রন্থখানি রচনা করেন। সাধু রামচাঁদ মুর্মুর বহু লেখা অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে আছে। বাংলা ১৩৬৯ সালে ২৯ অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করেন।

জল, জমি, জঙ্গল, সমাজ, জাতি ও দেশ রক্ষায় জনজাতি সমাজের বলিদানী পরম্পরার আর এক গৌরবময় সংযোজন হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকরাম প্রসাদ গ্রামের চুড়কা মুর্মু। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি খানসেনার হাত থেকে মাতৃভূমি রক্ষায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইদানীংকালে কল্যাণ আশ্রমের দ্বিতীয় সভাপতি জগদেবরাম ওঁরাও সারা জীবন অকৃতদার থেকে জনজাতি সমাজের জন্য দীর্ঘকাল ধরে স্বাবলম্বন, স্বাধিকার, জল-জঙ্গলের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে ৪ জন প্রধানমন্ত্রী ও ৩ জন রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া এক বিরল দৃষ্টান্ত।

(লেখক পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পূর্বক্ষেত্রের সহ-সংগঠন সম্পাদক)

সাধু রামচাঁদ অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী জানুয়ারি ২০২৩-এ ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৪।।

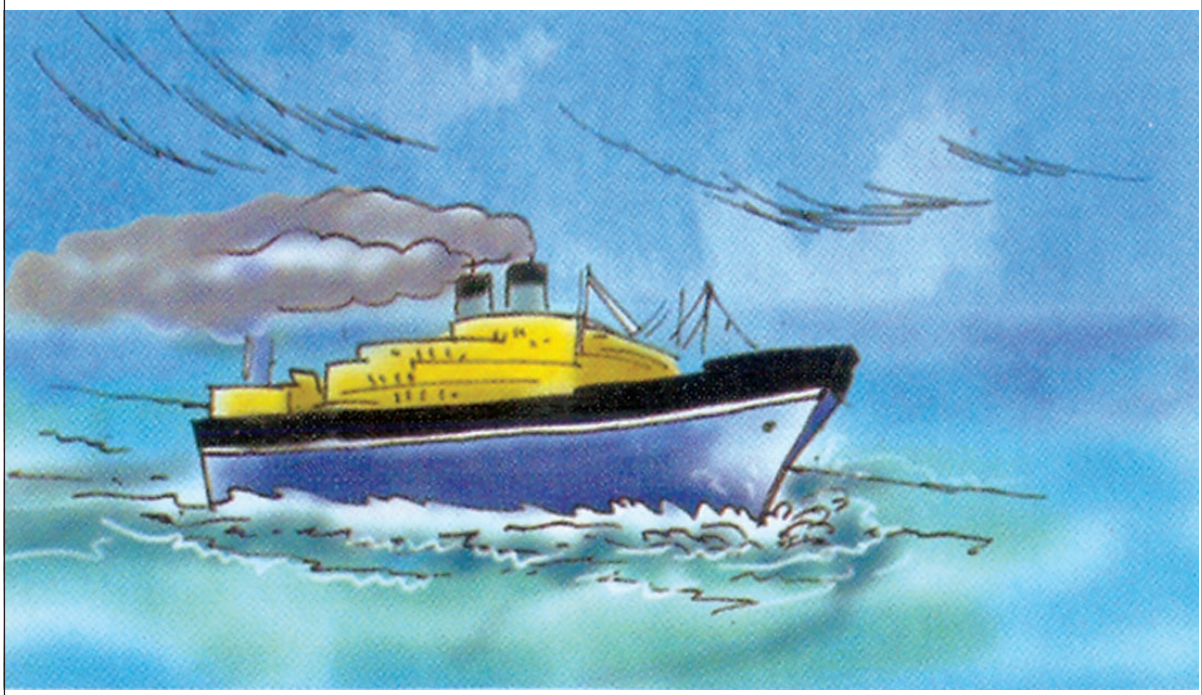

*এদিকে দ্রুত পয়সা ফুরিয়ে যাচ্ছে। মহানামব্রতজী জানতে পারলেন দু'দিন পরে **Rex** নামে একটি জাহাজ আমেরিকা যাবে জেনোয়া শহর থেকে। শেষ অর্থটুকু ট্রেনের টিকিট কাটতে ব্যয় হলো।*

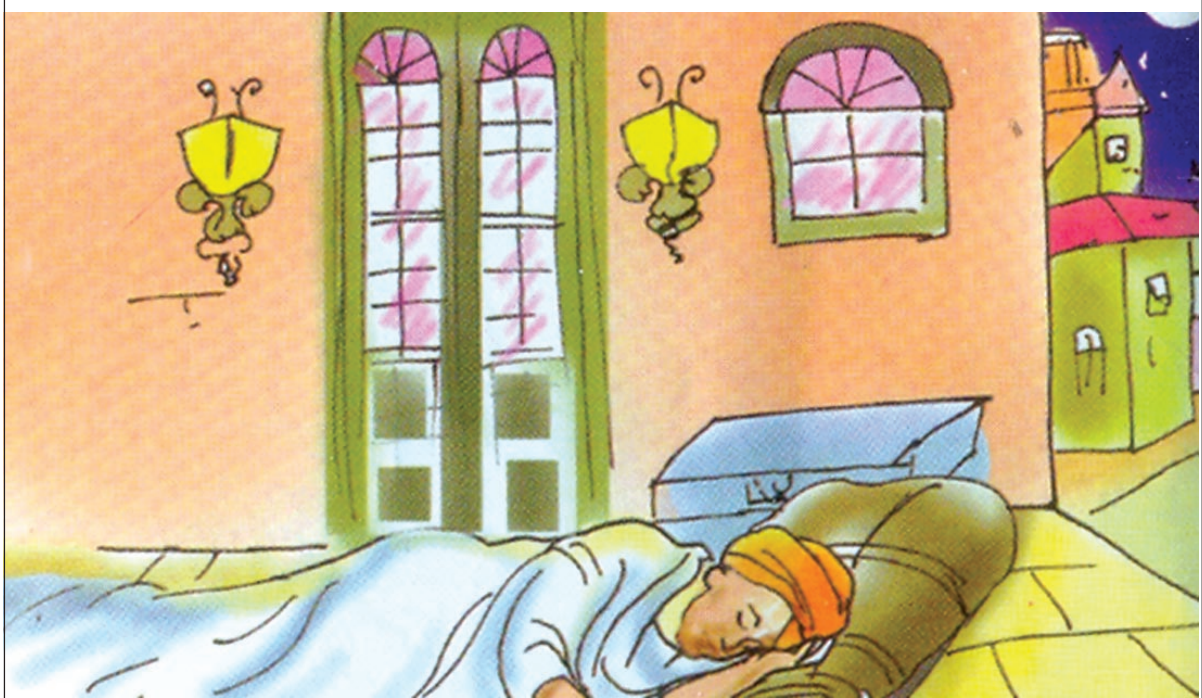

রাত ১০টার সময় জেনোয়ায় এসে পৌঁছলেন তিনি। পুলিশ তাঁকে প্ল্যাটফর্মে থাকতে দিল না। অবশেষে কাছাকাছি একটি বাড়ির বারান্দায় মালপত্র নিয়ে রাত কাটালেন।

(ক্রমশ)